দীপশিখা

এক

হাওড়া ষ্টেশন, বিকেল সাড়ে তিনটে। গাড়ী ছেড়ে দিল—ভস্ ভস্ ভস্। একটা জান্‌লায় মুখ বাড়িয়ে আমি দাঁড়িয়ে। আমি তখন জাগ্রত ছিলাম কি, কি ছিলাম জানি না, শুধু অনুভব করছিলাম, সমস্ত সত্বা যেন আমার চোখ দুটোয় গিয়ে জমা হয়েছে, সমস্ত অনুভূতি সেইখানে। প্লাটফরমে একদল লোক—আত্মীয় অনাত্মীয়, মা, বোন, ভাই বন্ধু—কত কে। চোখ দুটো যেন প্রাণ ভরে সকলকে একবার শেষবারের মত দেখে নিতে চায়। ইচ্ছে করে গাড়ীটা যেন না চলে, কিছু পরে চলে।

কিন্তু গাড়ীত থামে না—সে চলে—ভস্ ভস্ ভস্। চোখ দুটো আবছায়া হয়ে আসছে,—কাকে দেখ্‌ছি, কি দেখ্‌ছি

কিছু খেয়াল নেই, কেবল চেয়েই আছি। বাবাকে দেখে নিতে চাইলাম, কিন্তু কই তাঁকে ত পেলাম না। আরও এক জনকে বড় দেখে নিতে ইচ্ছে করেছিল, শেষবারের মত, কিন্তু চোখ এল জলে ভরে, কারও মূর্ত্তি চোখে জাগে না।

গাড়ীর গতি বেড়ে চলে। হঠাৎ শুন্‌লাম, কে যেন বল্‌ছে, পরিচিত বন্ধুর গলা—'বিদায় নিতে এলাম।' হাতটা যন্ত্রচালিতের মত বেরিয়ে গেল, মিল্‌ল তার হাতে। কে সে দেখ্‌লাম না, স্বরে চিন্‌লাম সে কে। সে বল্‌লে—'বিদায় নিতে এলাম'। আমি নিরুত্তর। গাড়ী আরও বেগে চলে; সেও সঙ্গে চলে।

হঠাৎ সে বল্‌লে—'এ কি চোখে যে তোমার জল। ছিঃ কাঁদ্‌তে আছে? এ কি ছেলেমানুষী?'

আমার পৌরুষে সে আঘাত কর্‌ল, আমার কি কাঁদ্‌তে আছে? কিন্তু হায়, মন কি আমার সে কথা মানে? তখন ইচ্ছে কর্‌ছিল একবার প্রাণ ভরে চোখের জল ফেলে নিই। আর ত কিছু কর্‌বার নেই, কাঁদ্‌ব না কেন? তাতে কিসের বাধা? আমি না হয় এখন বড় হয়েছি, তা বলে কাঁদ্‌তে নেই? ছোট বেলায় দুঃখ পেলেই কেঁদেছি। কে কি দেয়নি, কে মেরেছে, এমনি নিতান্ত তুচ্ছ কারণে কেঁদেছি। কিন্তু আজকে যে দুঃখ আমার জীবনে এল, তার মত বড় দুঃখ ত আর আসেনি। এমন দিনেও কি কাঁদতে নেই? এমন

দিনেও বিজ্ঞতার মুখোস পরে, মুখ গম্ভীর করে থাক্‌ব? আমার মন বলে তা কেমন ভাল হয় না। এত বড় দুঃখ আমার জীবনে এল, আমি তার সম্মান রাখ্‌ব, আমি প্রাণ ভরে কাঁদ্‌ব। তাতে কি ক্ষতি? লোকে ছেলে মানুষ মনে কর্‌বে? করুক গে!

খানিকক্ষণ হয়ে গিয়েছে। গাড়ীত আর প্লাটফরমে নেই, অনেক দূরে, খোলা আকাশের তলায় সবুজ মাঠের বুকের ওপর দিয়ে তীরবেগে ছুটে চলেছে। আকাশ ঘন নীল, এতটুকু মেঘ তার সুবিস্তৃত বুকের কোথাও দেখা যায় না। সূর্য্যের আলো, গাছের পাতায়, মাঠের ওপর, নদীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছে, হেসে যেন কুটি কুটি। এ কি আমার প্রতি উপহাস? দূরে ওই সহরের আকারটা ক্রমশঃই ঝাপ্সা হয়ে আস্‌ছে, দু মিনিট পরেই আর দেখা যাবে না, দিগন্ত-রালের মসীছায়ায় একেবারে মিলিয়ে যাবে। চোখ এখনও আমার জলে ভরা, গাড়ীর ভিতরে মুখ আন্‌বার জো নেই এক দল লোক। কি জানি ভাব্‌বে ছেলেটা ভারি ছেলে-মানুষ। বাহিরে চেয়েই থাকি।

* * * *

কত কথাই না মনে পড়ে একে একে। বিলেত যে যেতে হবে তা কোনদিন ভাবিও নি, আকাঙ্খাও করিনি, তাই মনকে কোন দিন প্রস্তুতও করিনি তার জন্য। চিরকাল

বাবা মার কাছে ছিলাম, একদিনও কাছ ছাড়া হইনি
সে জন্য যেদিন খবর বার হল আই সি এস্ পাশ করেছি
সেদিন মনটাকে ঠিক করে নিতে রীতিমত কষ্ট হয়েছিল।

মনে পড়ে মা আমার সকাল বেলা খাবার দিতে এসেছে
হাতে তাঁর খাবার দেখ্লাম। মাকে বল্লাম—মা আমাদে
পরীক্ষার খবর বের হয়েছে।

মা বল্লেন—কি হয়েছে ?

উত্তর দিলাম—লিখছে আমি পাশ করেছি।

মার কি ভীষণ বিরক্তি সে খবরে। কেঁদে উঠে বল্লে
'চাইনা এ খবর। কে এমন খবর দিতে বলেছিল ?' আমা
তাঁকে ছেড়ে বিলেত যাওয়াটা এমনি অসহ্য তাঁর কাছে।

যাই হক, বুঝলাম আমার বিদেশ যাবার পরওয়ান
এসেছে, যেতেই হবে আমাকে। মনকে অল্প অল্প কে
প্রস্তুত করি, সুদীর্ঘ কালের জন্যে মা বাবাকে ছেড়ে থাক্
হবে, ভাই বোনদের কাছ ছাড়া হতে হবে। এমনি কে
আস্তে আস্তে দিন যায়।

তারপর—তারপর সেও এক হঠাৎ হয়ে যাওয়া কাহিনী
দেখি আরও একজন আমার জীবনে ক্রমে হাজির, ভাবী
বিচ্ছেদের দুঃখটাকে বাড়িয়ে দিতেই যেন। তিনি
যেসে ভাবে এলেন না, এলেন একেবারে আমার পরমতম
আপনটী ভাবে।

স্বল্প ক'টি দিন। একে একে যায়। যত যায় তত আমাদের বিচ্ছেদের দিন এগিয়ে আসে। সেই আসন্ন বিচ্ছেদ আমাদের মিলনের প্রতি মুহূর্ত্তটি যেন আচ্ছন্ন করে রেখে দিত। আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মত দিনে দিনে বড় হয়ে, ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করে আমাদের দিকে এগিয়ে আস্‌ত।

তারপর সত্য সত্যই এসে হাজির হল, সেই একান্ত ভয়ের দিনটা। ভোরে ঘুম ভাঙ্‌তেই, মনে পড়ে গেল, আজ সেই দিন। পাশে চেয়ে দেখি আমার নূতন পাওয়া সাথীটি তখনও ঘুমন্ত। কতক্ষণ চেয়েছিলাম জানি না, নিমীলিত চক্ষু দুটি খুলে গিয়েছে, কুঁড়ি হতে ফোটা দুটি ফুলের মত। সে দুটি চোখ জলে ভরা, আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় কাতর। সে দিন যে কি করে আমরা পরস্পরকে ছেড়ে এসেছি তা মনে নেই। মনে হওয়া বড় কষ্টকর। ভুলেছি ভাল হয়েছে।

আর মনে পড়ে একটি ক্ষণ সেই স্মরণীয় দিনের। হাওড়ার দিকে গাড়ী করে চলেছি। পাশে তিনি। আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথায় সকলেরই মন ভারাক্রান্ত, কারও মুখে একটি কথা নেই। আমি মাথা নীচু করে নিজেকে সংযত রাখ্‌বার চেষ্টা করছি। তারই মাঝে অবসর পেয়ে যখনই একজনের পানে চোখ ফিরিয়েছি, দেখেছি তার চোখ জবাফুলের মত লাল হয়ে গেছে, একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে। সে চোখ জানিয়ে

দেয় একখানি সুনিবিড় ব্যথার কথা; তাতে একখা
করুণ মিনতি লেখা—"যেতে দিব না।" কিন্তু সে মিনা
নিষ্ফল, যেতে যে দিতে হবে।

* * * * *

অনেকক্ষণ যেন কেটে গিয়েছে। ট্রেন চলেছে, চলেছেই
এখন ত রবির আলোর তেজ নেই, পশ্চিম আকাশে সে ক্লা
হয়ে গিয়ে গা এলিয়ে দিয়েছে। দিগন্তের কালো ছায়
গুলো ক্রমশঃ বড় আকার ধারণ করে চারিদিক হতে ছু
আস্‌ছে কালো দৈত্যের মত। সেগুলো সব ঢেকে আবছা
করে দিল। বাহিরে ত কিছু দেখা যায় না, কেবল বিপু
অন্ধকারের বিস্তার, আমার জীবনে যে মেঘটা আজ নাম
তারই মত ঘন কালো! চোখটা লাল হয়েছে? এখন রাতে
অস্পষ্ট আলোতে ভিতরে মুখ ফেরালে ক্ষতি কি? কেউ
ধর্‌তে পারবে না।

রাত্রি অনেক হয়ে গিয়েছে, আমি গাড়ীর কোণে শুয়ে
গাড়ী চলে আর দোলে—সে কি আমাকে সান্ত্বনা দেবা
প্রয়াসে? আমার মন ত সান্ত্বনার গণ্ডীর বাহিরে চ
গিয়েছে। এক সুর আজ বড় করে বাজে আমার হৃদয়ে, আ
কোন সুর ত শুনতে পাই না। একখানি ব্যথা আজ আমা
সমস্ত হৃদয়কে ভরে দিয়েছে আর কোন ব্যথা বা আনন্দের
হৃদয়ে আজ স্থান নেই। একখানি অনুভূতি সমস্ত দেহ ম

ছেয়ে দিয়েছে, তিল স্থান ত কোথাও নেই আর কোন অনু-ভূতির জন্য। আমি বড় নিঃসঙ্গ, বড় একা। ঘুম কোথায়? সেওত আস্‌তে চায় না আমার চোখে। আজ শুধু ছাড়া-ছাড়ির পালা, আত্মীয়তমের হতে আরম্ভ করে, সকল আত্মীয়ের সঙ্গে, দেশের সঙ্গে, সকলের সঙ্গে। তাই বুঝি ঘুম আজ তার সঙ্গে সায় দিয়ে পলাতক! হবেও বা।

দুদিন দুরাত্রি চলার পর বোম্বাই সহরে এসে গাড়ী থাম্‌ল। পথে দুধারে একঘেয়ে দৃশ্য,—মাঠ আর পথ, পথ আর মাঠ, মাঝে মাঝে ঝোপ, মাঝে মাঝে পল্লী।

বোম্বাই সহর, সুন্দর সহর। তার প্রশস্ত বুকের উপর দিয়ে বড় বড় রাস্তা চলে গিয়েছে। পাশে সারবন্দী বাড়ী গুলো মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে, কেউ পাঁচ কেউ বা ছতালা উঁচু। গায়ে তাদের রঙ-বেরঙের তুলিপাত হয়েছে, কোনটা নীল, কোনটা হলদে কোনটা লাল, প্রত্যেকটি ভিন্ন ভঙ্গীতে গড়া। বোম্বাইএর স্থাপত্যেও রঙে বৈচিত্র আছে, তাই মানায়। রেল, মটর, ট্রাম—এরা আর সব বনিয়াদি সহরের মতই তার সম্ভ্রম বজায় রেখেছে। পাশে এই মালাবার পাহাড় দাঁড়িয়ে। নীল আকাশের গায়ে সুন্দর ফুটে উঠেছে। থাকে থাকে বাড়ীগুলো সাজান, তাদের ছাদগুলো দূর হতে মনে হয়, সিড়ির মত থাকে থাকে উপরে উঠেছে। মাঝে মাঝে গাছের ঝাঁক তাদের টালির ছাতের একঘেয়ে

লাল রঙের মধ্যে সবুজের আমেজ লাগিয়ে দিয়ে সুন্দর মানিয়ে দিয়েছে। বোম্বাইএর ধনীতম লোকের বাসস্থান এটা, তাই সহরের উচ্চতম স্থানটুকু অধিকার করে, ধনের মর্য্যাদা সকলকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যেন।

কিন্তু বোম্বাইএর সব থেকে গৌরবের জিনিষ হল তার চারি পাশের সমুদ্র। সাগর মায়ের বুকে শুয়ে এ যেন সাগরেরই লালিত শিশু। সাগর তাই সাদরে লক্ষ লক্ষ ঢেউ মেলিয়ে ব্যগ্র আলিঙ্গনে তাকে ধরে রেখেছে, কেউ পাছে তাকে স্পর্শ করে। সহরের ওপারের যে দিকেই চাও অনন্ত সমুদ্র— তার সীমা চোখত কোথাও খুঁজে পায় না। তার জল সহরের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে, সেখানে তা কাদা গোলা, হল্‌দে রংঙের; আরও দূরে তা সবুজ, আরও দূরে সাগর যেখানে গভীরতর সেখানে তা নীল, তারপর আরও নীল হয়ে একেবারে কালোর মত হয়ে গিয়েছে। দূর হতে ঢেউগুলো যখন মাথায় ফেণার মুকুট পরে লোলুপ রাক্ষসের মত তেড়ে আসে, ভারি ভয় লাগে, মনে হয়, এই বুঝি আমাদের লুটে নিল। কিন্তু তা ত নয়, কাছে এসে ছোট হতে ছোটতর হয়ে যায়; শেষে যখন পায়ের কাছে আসে তারা তখন সাদরে পাদুটো ধুয়ে দিতেই জানে, তার বেশী দৌরাত্ম্য জানে না। রাত্রে সহরটি আরও সুন্দর লাগে। সে দিন ছিল শুক্লা ত্রয়োদশী, আকাশও মেঘ মুক্ত। চাঁদের

আলোয় স্নান করে সহরটি যেন আরও তাজা হয়েছে, সদ্যস্নাতা সুন্দরীর মত। অস্পষ্ট আলোতে বাড়ীগুলো নিস্পন্দ প্রহরীর মত সারবন্দী দাঁড়িয়ে। গাছগুলো নিবাত-নিষ্কম্প, সাদা জ্যোৎস্নার মাঝে মাঝে কালো থোপের মত ছড়ান। আর চারি পাশে জল, শুধু জল। চাঁদের আলোর স্পর্শ পেয়ে সমুদ্রের ফেণাগুলো যেন আরও সাদা। ঢেউএর আগে চাঁদের আলোগুলো যেন জমাট বেঁধে এসে আবার ঠিক্‌রে ভেঙ্গে পড়্‌ছে, আবার ঢেউএর মাথায় জড় হয়ে আবার ভেঙ্গে পড়্‌ছে। লক্ষ মাণিক জ্বালা বল্‌লে উপমাটা ঠিক হবে না। কালো রঙের মেঘে যদি অসংখ্য বিদ্যুৎ এক সঙ্গে খেলে যায়, তা যেমন মানায়, এ অনেকটা সেই রকম। সহরের চারি পাশ জুড়ে সারা রাত এই রকম সাগরের খেলা চলেছে। সে উৎসবের জন্য পয়সা খরচের দরকার হয় না, অনাদি অনন্ত কাল আপনা হতেই এই রকম চলে।

দুই

একটি দিন মাত্র হাতে। ভারতের শেষ প্রান্তে এসে ভারতের সঙ্গে বিচ্ছেদকে মন-সওয়া করে নিতে একদিন মাত্র সময় পেয়েছিলাম। সেই একদিনে বোম্বাই-এর সাথে পরিচয়।

আজ ভারতের সঙ্গে একেবারে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার দিন এসেছে। ডাঙার সম্পর্ক ছেড়ে জাহাজে উঠেছি। ওই ত চোখের সামনে দেশের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকে গেল। যে দেশে জন্মেছি সে দেশের স্পর্শটুকুও আমার দেহ আর পায় না। এতক্ষণ সব হারিয়েও এটুকু সান্ত্বনা মনে [illegible]। যে এখন যাদের হারিয়েছি, যাদের কাছে পেতে আমি চাই, তারা ও আমি একই দেশে আছি। কিন্তু এখন আমার শেষ সম্বল সে সান্ত্বনাটুকুও হারিয়ে বসলাম। ওই চোখের সামনে এখনও বোম্বাই সহর, পাশে পশ্চিমঘাটের পর্ব্বত-

শ্রেণী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এখনও তা দেখা যায়। আর কিছু বাদে ওটুকুও থাকবে না। আমার ভারত, আমার দেশ দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখের সামনে ওই আকাশের নীল দেহের সঙ্গেই মিলিয়ে যাবে। দেশ হবে আমার তখন আত্মীয়দের মতই স্বপ্নদেশী।

জাহাজ ছাড়্‌ল। ডাঙা হতে আমরা এখন দূরে, পর মূহূর্তে আরও দূরে, তারপর আরও দূরে। বোম্বাই সহরটা ক্রমশঃ ছোট হতে ছোটতর হয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল। দূরে পশ্চিমঘাটের পাহাড় এখনও অস্পষ্ট দেখা যায়, তাও ত ওই দেখ্‌তে দেখ্‌তে আরও আবছায়া হয়ে আস্‌ছে। তারপর কই, আর ত দেখা যায় না, দিগঙ্গনাদের আঁচলের তলায় তারা তলিয়ে গেছে! ভারতের শেষ নিদর্শনও এখন বিলোপ! স্বদেশ এখন স্বপ্ন!

আমরা এখন সমুদ্রের প্রায় বুকের ওপর এসে পড়েছি। জলের ঘোলাটে সাদা রঙ ক্রমশঃ সবুজ হয়ে এখন গাঢ় নীলে এসে ঠেকেছে, কোথাও এতটুকু ডাঙার চিহ্নও দেখা যায় না। যেদিকে চোখ ফেরাই, কেবল জল, শুধু জল, দিগন্তের কোণ পর্যান্ত বিস্তৃত হয়ে গিয়েছে। ওপরে অসীম আকাশ, নীচে অনন্ত জলের রাশ। ওপরের রঙ ফিকে নীল; নীচের রঙ গাঢ় নীল, প্রায় কালো। দিগন্তের কোলে গিয়ে আকাশের ফিকে নীল ঘন হয়ে এসেছে—সেখানে সবই আবছায়া

কোথায় জলের শেষ, আর কোথায় আকাশের আরম্ভ, ঠিক যেন ধরা যায় না। একঘেয়ে জলের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ শ্রান্ত হয়ে পড়ে, ওই আবছায়া দিগন্তরালে ঠেকা খেয়ে সে যেন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

আমাদের এ সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্‌বার বেশীক্ষণ আর সময় রইল না। জাহাজ একেবারে মাতালের মত টল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। আমাদের ডেকের উপর দাঁড়িয়ে থাকা এখন একান্ত কষ্ট সাধ্য। এই যে এক দল লোক ছিল ডেকের ওপর, সব যেন মিনিট কয়েকের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে কোথায় চলে গেল। আমরা অতি সাহসী কয়েকজন তখনও ডেকে আছি।

আমার বন্ধু সহসা টল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। মাথা ঘোরে তার, সে কেবিনে যেতে চায়। কিন্তু দোলানির জোরে পা এপাশ ওপাশ ফিরে যায়, হাঁটাই তার দায়।

তাই দেখে একদল লোক হো হো করে হেসে উঠ্‌ল। কিন্তু এ আনন্দ উপভোগ তাদেরও বেশীক্ষণ ভাগ্যে জোটে নি। একের দুর্দ্দশায় অন্যের আনন্দ—এ অবিচার বেশীক্ষণ বোধ হয় কোন এক অদৃশ্য জনের দৃষ্টি এড়ায় নি। তাদেরও ও কিছুক্ষণ পরে সেই দশা। বাধ্য হয়ে সকলকেই ডেক হতে সরে কেবিনে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

তখন ভরা 'মনসুনের' সময়। আরব সাগর তাই রুদ্র

বেশী। আকাশে কালো কালো জলবাহী মেঘগুলো দৈত্যের মত দল বেঁধে ছুটে চলেছে। পবন তাদের বাহন, যুদ্ধ-যাত্রী ঘোড়ার মতন সে পবন ক্ষিপ্রগতি। সেই ঝোড়ো হাওয়ার আহ্বানে সাগর জেগেছে, তার বাঁশীর সুরের বাণী সাগরের মরমে পশেছে। তাই সেও তাদের সঙ্গে তাল রেখে জেগে উঠছে। সাগর ত আগে কখন ও দেখিনি, তাই কত শান্ত হতে সে জানে তা জানা ছিল না। কিন্তু কত অশান্ত হতে সে জানে সে পরিচয়টি সে দিয়ে দিল একেবারে প্রথমতম দর্শনে। তার সে রূপটি দেখ্‌তে খুব সুন্দর ঠেক্‌লেও শরীর বড় বইতে পার্‌ল না। মাথা ঘোরে, গা কেমন করে, শুয়ে পড়্‌তে হল কেবিনে গিয়ে।

কেবিনে শুয়ে শুয়ে চোখ বুজিয়ে আমরা পড়ে থাকি। কেবল গা বমি বমি করে, কিছু খাওয়াত দূরের কথা, শরীরে কি রকম অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হয়। জাহাজ টলে আর সেই সঙ্গে আমাদের গা শিউরে ওঠে।

নীচের বার্থে শুয়ে আমার বন্ধু ডাকে শুন্‌তে পাই—'মাগো মা'।—মাকে কাছে পেতে, তাঁর একটুখানি করুণ দৃষ্টি, একটু খানি হাতের স্নেহময় স্পর্শের এখন যেন বড় দরকার। মানুষ অসুস্থ হলে কেমন যেন সে ছেলেমানুষ হয়ে যায়; যেন একান্ত অসহায়। তার মধ্যের সেই আদিমকালের ঘুমন্ত শিশুটি তখন যেন জেগে ওঠে—আর

সেই সঙ্গে জেগে ওঠে তার চিরকল্যাণময়ী মায়ের মূর্ত্তিটি মনে। তাই বুঝি সে অসুস্থ হলে, অসহায় হলে ডেকে ওঠে—'মাগো মা।'

ভয়ঙ্কর যে কত সুন্দর হতে পারে সে দিন তা খুব ভাল করে জেনে নিয়েছি। ছোটবেলায় কত কালবৈশাখীর ঝড় দেখেছি; সে রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু রুদ্রের এমন পূর্ণতম বেশটি ত আর কোনদিন দেখিনি। ডাঙ্গায় যে ঝড় তাতে আকাশ জাগে, বাতাস জাগে, গাছের ডাল জাগে; কিন্তু মাটি ত জাগে না, সে যেমন তেমনটি—নিথর, নিশ্চল, নিষ্কম্প। কিন্তু সাগর—যেখানে সমস্ত প্রকৃতি যেন এক সঙ্গে সে মাতনে যোগ দেয়—মনে হয় মাতন যদি দেখতে হয় এই সে মাতন বটে। এখানে আকাশ-বাতাস ত জাগেই, সঙ্গে সঙ্গে পাতালের দ্বার যেন খুলে যায়; মাটি ফুঁড়ে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ কালো কালো সাপ যেন বেরিয়ে আসে—তাদের প্রত্যেকটির মাথায় মাণিক জ্বলে। সার বেঁধে দলের পর দল তারা ছুটে চলে আসে—কার আহ্বানে, কোন দিক পানে—তা কেউ জানে না। অবিশ্রাম তাদের গতি, অনন্ত তাদের সংখ্যা, সারির পর সারি চলে আসে, দিনের পর দিন ধরে, তবু তার শেষ হয় না। এত সবে মাতনের আরম্ভ। রুদ্রের বাঁশীর সুর সবে তাদের কানে লেগেছে, মরমে তখনও পশেনি। মরমে যখন পশবে, তখনকার রূপের বর্ণনার ভাষা মেলা

ভার ; সে সৌন্দর্য্য ভাষায় ধরা দেয় না। হিমালয়ের সবকটি শৃঙ্গ যদি এক সঙ্গে সজীব হয়ে চলন্ত হয়ে ওঠে, তা হলে যেন সেরূপের খানিকটা প্রকাশ হয়। শৃঙ্গ গুলির আবছায়া দেহ হবে ঢেউ আর মাথায় যে বরফের মুকুট সে হবে ফেনা। সেই শৃঙ্গগুলি যেন অসীম আক্রোশে ছুটে চলে আসে কোন কল্পিত শত্রুর বিপক্ষে, তাই এত আস্ফালন। লাইনের পর লাইন, যতদূর চোখ যায় তত দূর দেখা যায় তারা আসছেই। ঠিক যেখানে আকাশ মিশেছে সাগরের সঙ্গে সেই খানটি হতেই যেন তারা জাগে, তারপর তারা ছুটে চলে, যেতে যেতে দিগন্তের অপর পাশে তারা মিলিয়ে যায়, চোখ আর তাদের ধরতে পারে না। সার বেঁধে চলেছে তারা, এই আছড়ে পড়ছে—পরমুহূর্ত্তে আবার সরোষে গর্জ্জে মাথা তুলছে। জাহাজটাকে আসার পথে অক্লেশে তারা বুকে তুলে নেয়, যাবার পথে আবার পেছনে ফেলে দিয়ে যায়। কেউ কেউ বিরক্তিভরে একটা ধাক্কা দিয়ে যায়, ফলে জাহাজের সারা দেহ থর থর করে কেঁপে ওঠে—তাকে আশ্রয় করে যতগুলি প্রাণী আছে তারাও শিউরে ওঠে। কি ভীষণ সে রূপ তবু কি সুন্দর! প্রাণ কাঁপে কিন্তু মন মনে মনে তাকে প্রণাম করে বলে—'ওগো ভীষণ তোমার ভয়ে আমি কাঁপি বটে, কিন্তু তোমার মাধুর্য্য আমায় মুগ্ধ করেছে। তুমি যদিও ভীষণ,

তবুও তোমায় আমি ভালবাসি। ওগো ভীষণ-মধুর, আমার প্রণাম লও!'

মা গো আর ত সহ্য হয় না। চার দিন চার রাত্রি ধরে বার্থে শুয়ে শুয়ে যন্ত্রণায় কেবল এ-পাশ আর ও-পাশ করেছি। আমাদের জাহাজের দোলানি ত আর থাম্‌তে চায় না। একটা করে ঢেউ এসে জাহাজটাকে একেবারে আকাশের মাঝখানে তুলে দেয়, আবার পরমুহূর্ত্তে সজোরে নীচে ঠেলে দেয়—বুঝিবা পাতালেই ফেল্‌বে। শুয়ে শুয়ে কেবল শুন্‌ছি ঢেউ এর সরোষ গর্জ্জন, আর পোর্ট হোল থেকে যেটুকু দেখা যায় কেবল দেখ্‌ছি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ঢেউগুলো আমাদের দিকে তেড়ে আস্‌ছে। সান্ত্বনা পাব কোথায়, আর ও ভয় পাই সেগুলোকে দেখ্‌লে।

আমার তলার বার্থে শুয়ে সহযাত্রী বন্ধুটিরও ঠিক সেই দশা। থেকে থেকে সে ডাকে শুনতে পাই 'মা গো মা'। ওই নামের মধ্যে যেটুকু সান্ত্বনা আছে, সেই টুকুই আহরণ করে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা হয়।

মাকে কি আমার মনে আসে না? আমারও আসে। কিন্তু আর এক জনের কথা আরও বেশী মনে আসে। কেন যে এমন হয় তা কি করে বলব?

মাঝে মাঝে অন্য কেবিন হতে আর এক বন্ধু আসে।

দু'জন ছিলাম, তিন জন হই। আমরা মনে মনে সঙ্কল্প করি গল্প করে যন্ত্রণার কথা ভুল্‌ব।

সে গল্প সুরু করে—"শুন্‌ছ, প্যাটেল্‌ বলে এক উকিল চলেছে আমাদের সঙ্গে ব্যরিষ্টার হ'তে। কিন্তু ঢেউএর দোলা তা'কে এমনি ঘায়েল করেছে যে সে সঙ্কল্প করেছে এডেনে নেমে পড়বে, আর পরের জাহাজে বাড়ী ফির্‌বে। ব্যারিষ্টার হবার ইচ্ছে তা'র আর নেই।"

সে কথা শুনে আমরা হাস্‌তে চেষ্টা করি। কিন্তু উপবাসী যন্ত্রণাক্লিষ্ট ঠোঁট, তা'তে হাসি ভাল করে ফুট্‌তে চায় না।

আমি প্রশ্ন করি—"ফির্‌তি পথেও যে এই সাগরই পাড়ি দিতে হবে সে খেয়াল তা'র আছে?"

অন্য বন্ধু বলে—"দেখ, তা'কে এয়ারোপ্লেনে চড়ে দেশে ফির্‌তে বোলো।"

কিন্তু এই পর্যান্ত। আমাদের আর কথা এগোয় না। গল্প জমে না। আবার নিঝুম হয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকি। বন্ধুও খানিক বাদে ফিরে যায় তা'র নিজের কেবিনে।

* * *

পাঁচ দিনের দিন সকাল।

কি একটা যেন বিশেষ পরিবর্ত্তন অনুভব কর্‌ছি চারি পাশে। জাহাজ ত আর দোলে না। গা হতে যেন একটা মস্ত বড় অবসাদ নেমে গিয়েছে। গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে

বস্‌লাম। পোর্ট হোলের কাচগুলো আজ খোলা। সেখান দিয়ে সমুদ্দুরের লবণ-কণা-বাহী হাওয়া আমাদের গায়ে এসে পড়ছে। পোর্ট হোল দিয়ে সাগরও বেশ দেখা যায়। এ সাগর যেন শান্ত; ঢেউ আছে, কিন্তু এ ঢেউ পাহাড় প্রমাণ নয়, ভয় দেখাতে জানে না—জানে নয়ন রঞ্জন কর্‌তে।

ষ্টুয়ার্ড এসে খবর দিয়ে গেল জাহাজ এখন এডেন উপ-সাগরে এসেছে, আরব সাগরকে আমরা পেছনে রেখে এসেছি।

চারিদিকে একটা জাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছে। জাহাজ-খানা এত দিন নির্জ্জীব ছিল, আজ যেন সজীব হয়ে উঠেছে। এত দিন নীরব ছিল, আজ কলরবমুখর। আমরা সব পোষাক পরে ডেকে গিয়েছি। সমুদ্দুরের জোলো হাওয়ার স্পর্শ পেয়ে শরীরটা তাজা হয়ে উঠেছে। আকাশ মেঘহীন, ঘন নীল, চারি দিকে উন্মুক্ত সাগর। আজই আমার সত্যিকা-রের সাগর সন্দর্শন হ'ল।

আরও একদিন কেটে গিয়েছে। জাহাজ এখন লোহিত সাগরের মুখে।

সাগর একেবারে শান্ত শিষ্ট শিশুটি, দুষ্টুমি এক [illegible] জানে না। জলে ঢেউ ত দূরের কথা, এতটুকু কাঁপন নেই—নিথর, নিষ্কম্প। একটা নীল রঙের কাচ যেন চারিদিক ব্যেপে রয়েছে। মনে ভ্রম হয় এ যেন সাগর নয়, বড় দীঘি,—বাতাস-হীন দিনে যেন খেলাধূলা ভুলে ঘুমাচ্ছে।

যে যার সব বৈঠক বসিয়েছে ডেকের ওপর। এখানে এক দল, ওখানে একদল, সেখানে একদল। সারা জাহাজে আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছে। এ আনন্দ-উৎসবে যোগ দেবার মত মনের অবস্থা আমার নয়। ডেকে এপাশ ওপাশ একা একা পায়চারি করি।

হঠাৎ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে নব পরিচিত প্রবাস-যাত্রী বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়; বলে—এ আমার বন্ধু, নাম এই—সেই সঙ্গে এ কথাটাও বেশ উৎসাহের সঙ্গে বুঝিয়ে দেয় যে আমি সদ্যপরিণীত, বিরহকাতর ইত্যাদি ইত্যাদি।

ওরা সকলে সে কথা শুনে হেসে ওঠে।

এক জন বলে—"আমরা হ'লেম দু' রকমে sick, কিন্তু তুমি হ'লে তিন রকমে।"

অন্যরা প্রশ্ন করে—"কেমন করে?"

সে বলে—"আমরা হলাম 'হোম সিক' আর 'সী সিক'। কিন্তু তুমি এক কাটি বেশী, তুমি হলে 'লভ সিক'ও বটে।"

সেই কথা শুনে চারিদিকে হাসির বন্যা বয়ে যায়।

আমি হাস্‌ব কি কাঁদ্‌ব বুঝি না—মুখে কোন রকম পরিবর্ত্তন আসে না সে উপহাসে। আমি বুঝি ওদের মাঝখানে আমি খাপ খাই না। আবার সরে পড়ি। রেলিং ধরে

দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে মুখ বাড়িয়ে দিই। সাগরের লবণবাহী শীতল বাতাস আমাকে স্পর্শ করে যায়, মাথাটা ঠাণ্ডা হয়—সাগরের নীল জল চোখকে স্নিগ্ধ করে। মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ভাবে কেটে যায়।

এই ক'দিনের পরিচয়ে সাগরকে আমি ভালবাসতে শিখেছি। মনে হয়, সে যেন আমার ব্যথা বোঝে, সে যেন সান্ত্বনা দেবার প্রয়াস করে। ওই ওর ঢেউগুলো আমার দিকে ধেয়ে আসে, ওরা যেন আমায় ডাকে তা'দের লক্ষ লক্ষ বাহু তুলে। বাতাস কী যেন বলে। সে কি সাগর-মায়ের মুখের বাণী? সে যেন বলে—'আয় আমার কোলে নেমে, আমার শীতল-করা বুকে নেমে।' তা'র ঢেউ-এর মাথায় সাদা ফেনার সাজি, সেগুলো যেন তা'র আশীর্বাদের মত আমার দিকে বয়ে নিয়ে আসে।

সন্ধ্যাকালে সূর্য্য যখন বিদায় নেয়, তখন তা'র পাণ্ডুর মুখখানি দেখ্‌তে বড় ভাল লাগে। সারাদিনের পথশ্রমে সে যেন বড় ক্লান্ত, তাই সাগর-মা তা'কে বুকে ডেকে নেয়। যে পথ দিয়ে সে নেমে যায়, সে পথে রাঙা-আলো র ছটা মেখে যায়—যেন স্বর্গে যাবার সোণার পথের শেষে সোণার তোরণদ্বার। ওই পথে যেন শান্তির দিশা মেলে, রঙের ঘটা যেন সেই কথারই ইঙ্গিত করে। আমারও নেমে চলে যেতে ইচ্ছা করে, ওই পথ বেয়ে।

রাতে চাঁদ আসে আকাশে। তা'র মুখের হাসির ছটা সাদা ফেনাগুলোকে আরও সাদা করে দেয়। সারা সাগর ব্যেপে এক স্বপ্নময় আবেশ নেমে আসে। তা'র সে স্বপ্নের আবরণে আমাদের সকল দুঃখ যেন সে ঢেকে দিতে চায়। অনেক ক্ষণ যায়, রাত্রি আরও গভীর হয়, চাঁদ আকাশের মাথায় উঠে, আবার ধীরে ধীরে নাম্‌তে থাকে;—সুদীর্ঘ আকাশ-পথ একলা সে পাড়ি দেয়। নীচে সাগরের জল নাচে, ইঙ্গিত করে কাছে ডাকে, শেষে অভিমানে লুটিয়ে পড়ে, তবু সে নামে না। স্কুল-গামী ভাল ছেলের মত সে আশপাশের সকল প্রলোভনকে এড়িয়ে নিদ্দিষ্ট পথ দিয়ে চলে যায়। শেষে যখন তা'র বিদায় নেবার সময় আসে, সে তা'র আলোর হাতখানি বাড়িয়ে দেয়, একেবারে সাগরের এ পাশ হ'তে ওপাশের দিক-সীমার কোল পর্য্যন্ত। সেই দিক-সীমার ওপাশে, দিগঙ্গনাদের আঁচলের আড়ালে কে যেন তা'র প্রিয়া লুকান আছে। তাই শেষবারের মত হাত বাড়িয়ে বিদায়-ক্ষণের স্পর্শটি নিয়ে নেয়;—সেই হবে তা'র পাথেয়, সাথীবিহীন একক পথে চল্‌বার।

লোহিত সাগর পাড়ি দেওয়া প্রায় শেষ করে আমরা এখন সুয়েজ উপসাগরে এসে পড়েছি।

এখানে সাগর এত অপ্রশস্ত যে দু'ধারেই ডাঙা দেখা

যায়। সাগর গভীর নয় বলে জলও ফিকে নীল হয়ে এসেছে। দুধারের দৃশ্য বড় একঘেয়ে—মাটির ওপরে কেবল দেখা যায় ধূসর রঙের বালির বিস্তার, আর তার মাঝে মাঝে বড় বড় পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা যেন শূন্য-শ্মশান-ভূমি-বিহারী ভূতের মত। তা'দের গায়ের কোথাও এতটুকু ঘাসের আবরণ নেই, সবুজের ছায়াটুকু পর্যন্ত চোখে পড়ে না। ধরণীর এমন নীরস নিরাভরণ মূর্ত্তি আর কোথাও দেখিনি।

সুয়েজ খাল পার হয়ে ক্রমে জাহাজ এখন পোর্ট সৈয়দএ থেমেছে। ঠিক সুয়েজ খালের উত্তর সীমানায় এবং ভূমধ্য সাগরের তীরে এই সহরখানি প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। যেন বলে দিচ্ছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মহা মিলনক্ষেত্র এইখানে। পশ্চিমের লোক পূবে আস্‌তে এই পথ দিয়েই যায়, আর পূবের লোক পশ্চিমে আসতে এই পথে আসে। এখানে এসেই পশ্চিমের লোকেরা প্রথম অনুভব করে যে তা'রা পূবের জগতে ঢুক্‌ছে, আর পূবের লোকেরা মনে করে এইখানেই তা'দের জগতের শেষ। এতদিন যেন তা'রা স্বদেশ ছাড়া হয়েও নিজেদের বৃহত্তর ভূমির মধ্যে ছিল, আর দুপা এগুলেই এখন হ'তে সে সত্যই বিভূমিতে পদার্পণ করবে। পোর্ট সৈয়দ শুধু দুইটি মহাদেশের মিলন-ভূমি নয়, পশ্চিমে তার আফ্রিকাও পড়ে রয়েছে। রাজনৈতিক বিভাগ অনুসারে সে

মিশরের অন্তর্গত। তাই এ যেন ত্রিবেণীসঙ্গম—তিনটি মহাদেশের মিলন-ক্ষেত্র।

ভূমধ্য সাগর দিয়ে যাবার পথে সাগরের একটানা জলের বিস্তারকে ভগ্ন করে কয়েকখানি দ্বীপ। তাদের প্রথম হ'ল ক্রীট,—তার বড় বড় পাহাড়ের শিখরগুলি আকাশের নীল পটে বেশ সুন্দর ফুটে ওঠে। আরও কিছুদূর এগিয়ে গেলে সিসিলি দ্বীপ চোখে পড়ে; তার ওপারে ইটালীর দক্ষিণ অংশ, মাঝে মেসিনা প্রণালী। সেখান দিয়ে যখন জাহাজ যায় দু'পাশে শস্যক্ষেত্র, নগর এবং রেলপথ সে দেশের সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়।

সিসিলি দ্বীপ অতিক্রম করে সমুদ্রে পড়্‌বার পরেই চোখে পড়ে এক অভিনব মনোরম দৃশ্য—ষ্ট্রম্বোলি আগ্নেয়গিরির অগ্নি ও ধূম উদ্গীরণ। ষ্ট্রম্বোলি হ'ল লিপারি দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একখানি দ্বীপ। সেটি ত দ্বীপ নয়, সমুদ্রের বুক ফুঁড়ে উঠেছে একখানি পাহাড়, সে পাহাড়ের মাত্র এক-খানি শৃঙ্গ। সেই শৃঙ্গের চূড়ায় যে গহ্বর আছে, তা হ'তে দিন নেই রাত নেই অনবরত ধূম উদ্গীরণ হচ্ছে। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সেই ঘন কালো ধূমের আঁধার ভেদ করে মাঝে মাঝে আগুনের হল্কা বেরিয়ে আসে, লাল টক্‌টকে তরল আগুন। সে আগুন তখনই পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নাম্‌তে থাকে। সে আগুনের প্রভা শুধু সেই

স্থানটুকুকেই দীপ্ত করে না, আশেপাশে সাগরের বুকেও মাইলের পর মাইল ধরে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সাগরের বুকে সেই অগ্নি-উদ্গারী পাহাড়ের ছবি প্রতিবিম্বিত হয়। সে দৃশ্য যে কত সুন্দর এবং কি গভীর ভাবে মনকে আলোড়িত করে, তা দেখেই অনুভব করা যায়, বর্ণনা কর্‌বার ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না।

পরের দিন সকালবেলা। জাহাজ এসে 'মার্সাই' বন্দরে থেমেছে। এখান হতে রেলপথে 'কালে' হয়ে আমরা ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে লণ্ডন যাব ঠিক কর্‌লাম। তাই এখানেই নেমে পড়্‌লাম।

তখন সবে মাত্র সকাল। গাড়ী ছাড়বে সেই রাত আটটায়। সারা দিনটা কাটাতে হবে—এই হ'ল সমস্যা। এজন্য আমরা তিন জনে মিলে ঠিক কর্‌লাম 'শারাবাঙ্ক' এ চড়ে আমরা 'প্রভেন্স' জেলা বেড়িয়ে আস্‌ব।

ফরাসী দেশের দক্ষিণে সমুদ্রের ধারের অংশটিকে 'রিভি-য়েরা' বলে; এ দেশ তারই অন্তর্গত। সে দেশের এই অংশটি প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং স্বাস্থ্যের জন্য জগদ্বিখ্যাত। এখানে স্বাস্থ্যের জন্য এবং আমোদ প্রমোদের জন্য সকল দেশের ধনীদের সমাগম হয়। আমাদের দেশের পুরীর মত সমুদ্র এখানে একেবারে কোলে, তবে দৃশ্য তা হতে আরও

মনোরম। পথে এ দেশের দৃশ্যটা দেখে নেওয়া যাবে, সে লোভ সামলাতে পারলাম না।

'শারাবাঙ্কে' চড়ে বসেছি। মটরখানা মস্ত বড়। আমাদেরই মত নানা দেশের যাত্রীতে তা পরিপূর্ণ। ফরাসীও আছে, কিন্তু তা'দের সঙ্গে কথা বল্‌তে বাধে। প্রথম ত আমরা বিজাতীয়, তারপর কি ভাষায় কথা বলে কে জানে! সঙ্গে যে 'গাইড' আছে সে পথে যেতে যেতে নানা দৃশ্য দেখিয়ে ফরাসী ভাষায় নানা কথা বলে যায়, তা ভাল করে বুঝ্‌তে পারি না। আমরা দৃশ্যগুলি দেখে নিজে নিজেই তার শোভা অনুভব কর্‌তে চেষ্টা করি।

মার্সাই সহর ছেড়ে আমরা এক পাহাড়ের গা বেয়ে উঠ্‌ছি। সেখান হতে সহরটা একখানা ছবির মত দেখাচ্ছে। পাশে সমুদ্র একখানি নীল শাড়ীর মত পড়ে রয়েছে। পাহাড়ের ওপর দিয়ে রাস্তা। ভারি মনোরম সে দৃশ্য।

তারপর কত গ্রামের ভেতর দিয়ে, কত শস্য ক্ষেত্রের মাঝ দিয়ে আমরা চলি। ছুপাশে কেবল চোখে পড়ে অলিভ গাছ আর দ্রাক্ষাক্ষেত্র।

আরও কতক্ষণ পরে মটর এক ছোট্ট সহরে এসে থাম্‌ল। এই আমাদের গন্তব্য স্থান। এখানের এক হোটেলে আমরা দুপুরের আহার শেষ কর্‌ব ব্যবস্থা হয়েছে।

সহরের কোলেই সমুদ্র খেলা কর্‌ছে—কখন রোষবশে

ছুটে আসে, কখন বা অতি মৃদু ভাবে উপকূলে ধাক্কা দেয়। বাতাস সেখানে এত ক্ষিপ্রগতি যে আমাদের যেন উড়িয়ে নিয়ে সাগরের কূলেই ফেলে দিতে চায়। মাথায় টুপি রাখা দায়, বার বার বাতাস তাকে উড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে। এই দেশেই ত 'মিস্ত্রাল্' নামে প্রাণ-কাঁপান ভয়-জাগান ঝড় বয়, তাই বুঝি এদেশী সাধারণ হাওয়াও এত ক্ষিপ্রগতি।

হোটেলে এক ফরাসী মহিলার সঙ্গে দেখা। তিনি বোধ হয় হোটেলের কোন কর্ম্মচারিণীই হবেন। তাঁর আচরণ দেখেই অনুমান করতে পেরেছিলাম তিনি আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে উৎসুক। তিনি বোধ হয় ঠাওর করেছিলেন আমরা ইংরাজি বুঝি। তাই কথা সুরু করলেন এই বলে—"হাউ ইজ্ ইওর কান্তিরি?"

আমরা আন্দাজ করে ধরতে পারলাম শেষের কথাটার মানে 'দেশ'। সরল বিশ্বাসে ধরে নিলাম আমাদের দেশের অবস্থা এখন কেমন সেই কথাই তিনি জেনে নিতে চান। তাই তাঁকে জানিয়ে দিলাম, যে দেশের অবস্থা ভালই, এখনও মহামারী বা দুর্ভিক্ষ কিছু ঘটেনি।

তিনি মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন যে আমরা তাঁকে ভুল বুঝেছি এবং তাঁর ইংরাজি ও ফরাসী মিশ্রিত অনেকগুলি কথা শুনে আমরা ধরে নিতে পারলাম—তিনি আমাদের দেশ

কোন্‌টা তাই জান্‌তে চেয়েছেন ; অর্থাৎ 'হাউ' স্থানে 'হোয়াট' হওয়া উচিত ছিল।

তখন আমরা যে ভারতবাসী সেই কথা তাঁ'কে জানিয়ে দিয়ে বিদায় হ'লাম।

তিন

অনেক দিনের পথ চলার পালা শেষ করে আমরা এখন ডাঙায় এসে আশ্রয় নিয়েছি। এখন আমরা লণ্ডন সহরের বুকে। কেবল একঘেয়ে জল দেখে দেখে চোখটা যেন বড় শ্রান্ত হয়েছিল, তাই ডাঙা দেখ্‌তে বড় ভাল লাগ্‌ল। এ দেশ আমার মাতৃভূমি নয়, বিদেশ বিভূমি, তবুও তাকে এত ভাল লাগ্‌ল! মাতৃভূমি না হ'ক, তা হতে পাঁচ হাজার মাইল দূরে হ'ক, মাটি ত বটে! তাই এত আমার কাছে প্রিয় তা। মাটির সন্তান আমরা, মাটির বুকে জন্ম আমাদের, মাটির বুকে আমরা মানুষ। তাই বুঝি মাটির এত টান আমাদের এত প্রবল, জন্মগত স্বভাবের মত হয়ে গেছে। মাটি আমাদের মা, মাটি আমাদের সহজ জীবনযাত্রার ক্ষেত্র, সেই-খানে আমরা ঘর বাঁধি, সেইখানে আমরা বাস করি। মাটির প্রতিই আমাদের আকর্ষণ ষোল আনা, সাগরের প্রতি ত এক

কণাও নয়। তাই সাগরের বুকে যখন ভাসি, মনে আমাদের ভয় লাগে, মাটিকে ফিরে পাবার জন্য ইচ্ছা জাগে। সাগর দোলা দিয়ে আমাদের ভয় সঞ্চারই করে, তার ঢেউগুলো যেন লোলুপদৃষ্টিতে আমাদের দিকে তেড়ে আসে। কিন্তু মাটির সবুজ ঘাসে ঢাকা কোল, নরম নিরেট নিষ্কম্প; আমাদের যেন কোল পেতে দিয়ে বসে থেকে আহ্বান করে। সে স্থির, সে ধ্রুব, সেইখানেই যেন শান্তি আছে, আরাম আছে। তাই সাগরের পরিবর্ত্তে যে দেশেরই মাটি হ'ক না কেন, তা এমন ভাল লাগে। তার কোলে যেন আমরা স্নেহ খুঁজে পাই, সান্ত্বনা খুঁজে পাই। মা না হ'ক, সে মাতৃজাতীয়া ত বটে।

আজ দিনকতক হ'ল আমরা এখন লণ্ডন সহরের বাসিন্দা হয়ে পড়েছি। কলেজ খুল্‌তে এখনও কিছু দিন দেরী আছে, একা একা অপরিচিত দেশে সময় কাটানও বড় দুষ্কর। তাই সহরটা এপাশ ওপাশ ঘুরে তার সঙ্গে একটু পরিচয় করে নেবার চেষ্টা করি।

লণ্ডন ত একখানি সহর নয়, সহরদের রাজা। কলকাতা আমাদের দেশের সব থেকে সেরা সহর, লণ্ডন হ'ল আয়তনে এবং লোক সংখ্যায় কম করে তার ছয় গুণ বড়। বাড়ীর পর বাড়ীর অরণ্য, মাইলের পর মাইল ধরে, পনের কুড়ি পঁচিশ মাইল ধরে। বাড়ী একতালা নয়, দুতলা নয়—ছয় আট দশ তলা করে। সে বাড়ীর স্থাপত্যে না আছে গঠনভঙ্গির

বৈচিত্র্য, না আছে রঙের বাহার। সে স্থাপত্যের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বাড়ীকে মজবুত করা, কার্য্যক্ষম করা, সুন্দর করা নয়। তাই সব বাড়ীই একই ভঙ্গিতে গড়া। এক এক পল্লীতে কেবলই এক ধরণের বাড়ী, একখানি দেখ্‌লেই সবগুলি দেখা হয়ে যায়; তা দেখে দেখে চোখ যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বাড়ীর এমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই যে পরিচয় দিতে বল্‌ব— সামনে তার বারাণ্ডা আছে, কি রঙ্‌টা তার লাল, যাতে তা সহজে খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। বাড়ী ধর্‌তে হবে কেবল নম্বর দিয়ে, আর কোন উপায় নেই তার। তাদের সকলেরই রঙ প্রায় এক 'সিপিয়া' রঙের, আকাশের ধোঁয়ার মতই পাংশু বর্ণ কালো, চোখকে এতটুকু স্নিগ্ধ করে না। রাস্তায় সারবন্দি বাড়ীগুলোকে দেখে মনে হয় যেন এক ধরণের খাঁকি পোষাক পরে একদল সৈন্য 'এটেনসন'-এর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে।

প্রতি বাড়ীর মাথায় দশ পনেরটা করে চিম্‌নি ধূম উদ্গার কর্‌ছে। সে ধূম কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরে উঠে আকাশটাকে ছেয়ে ঘোলাটে করে দিয়েছে। রাস্তা হতে অনেকেই বাড়ীর মাথা ডিঙিয়ে যদিও বা একটু আকাশ চো[illegible] পড়ে তাও সেই ধোঁয়ায় কলঙ্কিত। সে আকাশে তারা-ফুল ফোটে না, সে আকাশের কপালে চাঁদ-টীপ শোভা পায় না, সূর্য্য যদিও বা কখন কখন দেখা যায়, তা বড় ম্লান, বড় হীন-জ্যোতিঃ।

এই সব কারণেই লণ্ডন সহরকে আমার সুন্দর বল্‌তে ইচ্ছা করে না। তবে সে যে একেবারেই শ্রীহীন, এমন কথা অতি বড় নিন্দুকেও বল্‌তে পার্‌বে না। তার সেণ্টপলস্‌, পার্লামেণ্ট হাউস, ওয়েষ্ট মিনিষ্টার, ক্রীষ্টাল প্যালেস প্রভৃতি বাড়ী স্থাপত্যবিদ্যার চরম নিদর্শনস্বরূপ। হাড়ে হাড়ে ব্যবসাদার জাত হলেও তা'রা টেমস্‌ নদীর ধারের সমস্তখানি বাড়ী আর জেটি দিয়ে ভর্ত্তি করে দেয়নি, অনেকখানি অংশকে খোলা রেখে ফুল-বাগান দিয়ে, গাছ দিয়ে সাজিয়ে মনোরম করে রেখে দিয়ে তার নাম দিয়েছে ষ্ট্রেণ্ড। এটুকু সৌন্দর্য্যবোধ তা'রা হারায় নি।

কিন্তু সহরের সব থেকে সুন্দরতম অংশ হ'ল তার উদ্যান বা পার্কগুলি। তার হাইড পার্ক, রিচমণ্ড পার্ক, হেমষ্টেডহীদ সব বিশ্ববিশ্রুত। চারি পাশে মাইলের পর মাইল ধরে বাড়ীর বিস্তারের মাঝে এই সবুজ ঘাস আর গাছের মাঠগুলিকে যেন তুলনায় আরও মনোরম লাগে। সেগুলি যেন মরুভূমির মাঝখানে দীর্ঘ মরূদ্যানের মত। খাঁচার মত বাড়ীগুলোর খোপে বাস করে মন যখন হাঁপিয়ে ওঠে, বুকে হাঁপ ধরে যায়, তখন সেই উদ্যানে গিয়ে আশ্রয় নিলে যেন সব দুঃখ ভুলে যাই। সবুজ ঘাসের বিস্তার চোখকে স্নিগ্ধ করে। বাতাসের দোল খেয়ে গাছের পাতা নড়ে নড়ে আমাদের যেন সজীব প্রকৃতির আহ্বান বাণী জানিয়ে দেয়। ওপরে আকাশের

বিস্তারকে আবার আমরা ফিরে পাই। সভ্যতার কৃত্রিম জীবন হ'তে তাদের কোলে এসে ক্ষণেকের জন্য যেন আমরা প্রকৃতির সেই মধুর স্পর্শটুকু ফিরে পাই, যা' হ'তে সভ্য মানুষ স্বভাবতঃই বঞ্চিত। সকল কথা ভুলে গিয়ে আমরা যেন প্রকৃতির শিশু হয়ে পড়ি। মাঝে মাঝে তাদের জল, সে জলে পদ্ম ফোটে, মরাল ভাসে। গাছে গাছে পাখী ওড়ে, পাখী ডাকে। প্রকৃতির একচ্ছত্র রাজত্ব সেখানে।

এইখানেই সকল লণ্ডনবাসীর বিহারভূমি। শিশু সেখানে ঠেলা-গাড়ীতে চড়ে ঝি'র সঙ্গে বা মা'র সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, ছোট ছেলে-মেয়েরা সেখানে মাছ ধরে, নৌকা ভাসায়, ছুটাছুটি করে, তরুণ-তরুণী আড়াল খুঁজে গোপন-কোণে আলাপ করে, আর বুড়ো-বুড়ী গাছতলায় বসে বিগত জীবনের ইতিহাসের কথা আলোচনা করে। কেউ বা নৌকা নিয়ে দাঁড় বেয়ে চলে, কেউ বই নিয়ে ফাঁকা মাঠে বসে বসে আপন মনে পড়ে, কেউ বা মাঠে শুয়ে কেবল আকাশ পানে চেয়ে থাকে। কত বয়সের কত মানুষের মেলা সেখানে—যে যার আপন খেয়াল মত প্রকৃতির সঙ্গ সুখ উপভোগ করে।

লণ্ডন সাধারণ সহরের মত সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত নয়। তার দেহ বন্ধুর, উন্নত আনত, ঢেউ খেলান। সেটা যেন তার সৌন্দর্য্য অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে হ্যামষ্টেড অঞ্চলটি ছোট ছোট পাহাড়ে ভরা—ঠিক করে

বল্‌তে গেলে তাদের পাহাড় বল্‌ব না, বল্‌ব বড় বড় ঢিপি বা টিলা। সেখানের রাস্তাগুলো নীচু থেকে উঁচুতে উঠেছে, আবার নেমে গিয়েছে, বাড়ীগুলোও থাকে থাকে সাজান।

হ্যামষ্টেডহীদে এই রকম অনেকগুলি বড় বড় ঢিপি আছে, তাদের সব চেয়ে বড়টি হ'লো ৩০০ ফিট্ উঁচু। এই ঢিপিতে উঠেই অনেক সহরবাসী পাহাড়ে ওঠার সাধ মেটান—ঘোলে দুধের সাধ মেটানোর মত। শীত কালে যখন বরফে তার গা ঢেকে দেয়, তখন ছেলে-মেয়েরা সেখানে চাকাবিহীন কাঠের গাড়ী গড়িয়ে দিয়ে আমোদ করে, তার জন্য পয়সা খরচ ক'রে এবং কষ্ট ক'রে সুইটজারল্যাণ্ডে তাদের যেতে হয় না। অনেক লণ্ডনবাসী এমনি কূপমণ্ডুক যে, সামর্থ্য থাক্‌লেও লণ্ডন ছেড়ে বাহিরে যাবার কোন্ দিন সুযোগ হয়ে ওঠে না। তারা এই সহরেই জন্মায় এবং বড় হয়ে এই সহরেই সমাধি পায়। কাজেই এই হ্যামষ্টেডহীদ দিয়ে সত্য সত্যই তাদের পাহাড়ে চড়ার সাধ মিটাতে হয় এবং পাহাড় সম্বন্ধে ধারণাও ঠিক করে নিতে হয়।

এই পাহাড় সম্বন্ধে ধারণার কথায় একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল যেটা লিপিবদ্ধ করতে খুব লোভ হচ্ছে।

আমাদের এক ঝি ছিল, তা'র নাম নেলী; বয়স বছর চল্লিশ হবে। সে একেবারে লণ্ডনবাসী, জীবনে কোনদিন তার বাইরে পা দেয় নি। সে একদিন আমাদের দেশের কথা

জানতে চেয়েছিল আমাদের কাছে। আমার বন্ধু তার কাছে উৎসাহের সহিত দেশের বর্ণনা আরম্ভ করল—মস্ত বড় দেশ, তোমাদের ইংলণ্ডের দশটার সমান, সে দেশে পৃথিবীর সেরা পাহাড় আছে, তার নাম হ'ল হিমালয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে খুব মন দিয়ে শোনে আর ঘাড় নাড়ে।

বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করল—"কত বড় পাহাড় সেটা? আমাদের এই পার্লামেন্ট হিলের থেকে বড় কি?"

'পার্লামেন্ট হিল' হ'ল হ্যামষ্টেডবাসীদের সব থেকে উঁচু ঢিপিটা। কাজেই এহেন ছাত্রীকে হিমালয়ের উচ্চতা বুঝাবার চেষ্টা যে কতখানি ভ্রান্ত তা সহজেই অনুমেয়।

ইংরেজদের ব্যবসাপ্রিয়তার কথাই এতক্ষণ বলে এসেছি। কিন্তু তাঁদের মনের যে আরও একটা দিক আছে, তার কথা বলিনি। জার্ম্মাণী যতই অপবাদ দিক যে ইংরেজরা জাতকে-জাত দোকানদার, তবু একথাটা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না, যে জগতে তাঁরা বর্ত্তমানে একটি শ্রেষ্ঠ জাত। জগতে যে সব মনীষী জন্মে তাঁদের কাজ দিয়ে মানব-সভ্যতাকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তাঁদের একাধিকের জন্মভূমি এই সাগর দিয়ে ঘেরা দ্বীপটি। সেক্সপীয়র ও শেলীর মত কবি, নিউটন ও ডারউইনের মত বৈজ্ঞানিক, ডিকেনস্ ও স্কটের মত কথাশিল্পী—এই দেশেই ত জন্মলাভ

করেছিলেন। সেটা কি করে সম্ভব হ'ল, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমরা দেখব যে, এ দেশীদের অন্তরে অন্তরে একটী তীব্র জ্ঞান-পিপাসা বর্ত্তমান আছে। সেই পিপাসার তৃপ্তির জন্য তা'রা করতে পারে না এমন জিনিষ নেই। বাগ্‌দেবীর যথার্থ উপাসক হ'ল এরা—তাঁ'র পূজায় এরা ধর্ম্ম-অর্থ-মান ত তুচ্ছ কথা, জীবনকেও বলি দিতে মুহূর্ত্ত মাত্র দ্বিধা বোধ করে না। সত্যের জন্য এরা আকাশে ওড়ে, আফ্রিকার জঙ্গলে প্রবেশ করতে ডরায় না, মেরু প্রদেশে বরফের দেশে ছোটে।

এই জন্য ব্রিটিশ মিউজিয়মের বিরাট আকৃতি এবং ততোধিক আশ্চর্য্যকর ধনরাশি দেখে আমার মনে হয়েছিল এ যেন ঠিক মানিয়েছে। এ ত মিউজিয়ম নয়—বাণীমন্দির। বাণীর মন্দির যদি গড়তে হয় তা এমনতরই হওয়া উচিত। ব্রিটিশ মিউজিয়মের আকার ও ঐশ্বর্য্য যেন তা'দের জ্ঞানের প্রতি, বাগ্দেবীর প্রতি অনুরাগের গভীরতার নির্দ্দেশ করে।

চমৎকার ভঙ্গিতে বাড়ীখানি গড়া, চারিদিকে সারি সারি মোটা মোটা থাম। অনেকটা কলিকাতা সীনেট হলের মত; তবে আয়তনে তার থেকে অনেক বড়। ভিতরে চারিপাশে সব দর্শনীয় বস্তু শ্রেণীবিভাগে সাজান। ঠিক মাঝখানে কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মত গম্বুজবিশিষ্ট বিশাল পাঠাগার। সেখানে একসঙ্গে ছয় শত লোকের বসে

পড়ার ব্যবস্থা আছে। এইখানেই ইংরাজ বিদ্যার্থীরা বিদ্যা সঞ্চয় করে বাণীর অর্চ্চনা করেন। এই মাঝের হলের চারি পাশে দেয়ালের গায় চল্লিশ ফুট উঁচু আলমারিতে সব বই সাজান আছে, পাশের ঘরেতেও আছে। চারিপাশের ঘর-গুলিতে সেকালের নামজাদা জাতিদের কীর্ত্তির নিদর্শনসমূহ সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। গ্রীক ও রোমান ভাস্করদের নির্ম্মিত মূর্ত্তিগুলি তার এক অংশকে অলঙ্কৃত করছে। আর এক অংশে সুমেরীয় সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ অনেকগুলি অতিকায় প্রস্তর মূর্ত্তি রক্ষিত হচ্ছে। আমাদের দীনহীন ভারত-মায়ের কীর্ত্তির নিদর্শন এক কোণে পড়ে রয়েছে। কিন্তু সব থেকে চিত্তাকর্ষক হ'ল পুরাণ মিশর-সভ্যতার নিদর্শনগুলি। ব্রিটিশ মিউজিয়মের সব থেকে সমৃদ্ধ অংশ হ'ল এইটী এবং তার সব থেকে গৌরবের জিনিষ যেন এই মিশরী সভ্যতার নিদর্শনগুলি। আর কোন মিউজিয়মে এত প্রচুর পরিমাণে তাদের পাওয়া যাবে না।

মিশরীদের নির্ম্মাণ-কৌশল, ভাস্কর্য্য ও কারুকার্য্যের অনেক নিদর্শন এখানে দেখতে পাওয়া যায়। দেখে মনে হয়, নীল নদের কোলে বর্দ্ধিত এই প্রাচীন মিশরীরা কি বিস্ময়কর কীর্ত্তিই না জগতে রেখে গিয়েছে। খৃষ্টপূর্ব্ব চার পাঁচ হাজার বছর আগে যখন জগতের অন্য জাতিরা অসভ্যতার অন্ধকারে দিন কাটাত, তখনই সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকে যে এই দেশটা

উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছিল, তারই সাক্ষ্য হ'ল এই দ্রষ্টব্য বস্তুগুলি। কিন্তু দ্রষ্টব্য বস্তুগুলির মধ্যে সব থেকে যা মনকে আলোড়ন করে তোলে তা হ'ল 'মামি' বা রক্ষিত শব।

মিশরীদের ধারণা ছিল যে মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা একেবারেই দেহকে ছেড়ে যায় না, এক দিন না একদিন তা ফিরে আসে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে তা'রা মৃতের শবগুলিকে খুব যত্নের সহিত রক্ষা করত। মিশরী-সভ্যতার আদি যুগে যখন তা'দের জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হয় নি, তখন তা'রা সমস্ত শবটাকে রক্ষা করা অসম্ভব দেখে মাংস বাদ দিয়ে কেবল হাড়গুলিকে রক্ষা করত—বেহুলা যেমন লক্ষ্মীন্দরের হাড় রক্ষা করেছিল। এই জাতির খৃষ্টপূর্ব্ব তিন হাজার বছর আগেকার দুটি কঙ্কাল এখানে রক্ষিত আছে। তারপরে সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এরা কতকগুলি বিশেষ আরক উদ্ভাবন করে শবদেহ রক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। আরকে সিক্ত কাপড়ে শবদেহ জড়িয়ে তা কাঠের বাক্সে পুরে রাখা হত। এই রকম রক্ষিত শব এখানের দু'টি বড় বড় ঘরের সকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে।

সেখানে গেলে মনে এক নূতন ধরণের ভাব সঞ্চার হয়। মনে হয় চারিপাশে এই যে এত শব রয়েছে, এরা হাজার হাজার বছর আগে এককালে আমাদেরই মত সজীব ছিল,

এদেরও বুকে এককালে আমাদেরই মত সুখ-দুঃখের কত তরঙ্গ বয়ে গিয়েছে। এখন সব নিস্তব্ধ নিঃসাড়। এদের আত্মীয়-স্বজন কত যত্নে এদের শবগুলিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছে,—তা'রা একদিন না একদিন পৃথিবীতে ফিরে আস্‌বে এই ধারণা নিয়ে। কিন্তু তারপর কত কাল কেটে গেল, হাজার হাজার বছর কেটে গেল, তবুও ত সে আশা পূর্‌ল না! পূর্‌বেও না কোনদিন। এখন কেবল ক্ষুদ্র মানুষের বিরাট ব্যর্থতার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াই এদের একমাত্র সার্থকতা।

চা[illegible]

আমরা পথ দিয়ে চলেছি, দু'-তিনটি ভারতীয় একসঙ্গে, লণ্ডনের এক [illegible]র মধ্য দিয়ে। দূরে একদল ছেলেমেয়ে আপন মনে খেলা করছিল। হঠাৎ আমরা তা'দের দৃষ্টিপথে পড়ে গেলাম। আর যায় কোথায়? তা'রা আমাদের কাছে ছুটে এসে আমাদের চারিদিক ঘিরে চীৎকার সুরু করলে—ব্ল্যাকি নিগার ব্ল্যাকি নিগার।

কেবল তাতেই ক্ষান্ত হ'ল না তা'রা। পাশে এক বালির গাদা ছিল, তা' হ'তে মুঠো মুঠো বালি তুলে আমাদের গায়ে ছুঁড়্‌তে লাগ্‌ল।

বিদেশী আমরা, কত দূর হতে অতিথি হয়ে তা'দের দেশে এসেছি, স্বাগত সম্ভাষণটা মন্দ হ'ল না। সব থেকে আশ্চর্য্য লাগে আশেপাশে যারা বয়স্ক লোক ছিল, তা'রা তা'দের সে

কাজে বাধা দিলে না বা নিরুৎসাহ করল না—যেন তা'দের এই প্রকার সম্ভাষণে মৌন সম্মতি ছিল।

বিলাতে এই রকম ঘটনা প্রায়ই হয়। এমন ভারতীয় নেই বোধ হয়, যে "ব্ল্যাকি" ও "নিগার" এই দুটি মধুর সম্বোধন না শুনে দেশে ফিরেছে। বর্ণ-জ্ঞানটা এদের ভারি প্রখর, সেই ছোট ছেলে হ'তে বুড়ো পর্য্যন্ত সকলেরই। তার মানে এরা মানুষকে বর্ণ হিসাবে দুই ভাগে ভাগ করে,—এক হ'ল সাদা, আর দুই নম্বর হ'ল কালো। প্রায় কয়লার মত কালো নিগ্রোর রঙও এদের চোখে যেমন কালো, ফরসা গৌরবর্ণ ভারতীয়ও এদের চোখে তেমন কালো। হলদে রঙ চীনেরাও এদের চোখে কালো। বর্ণ অনুসারে বিভাগটা এরা বেশ সুবিধার করে নিয়েছে, এক সাদা অর্থাৎ ইউরোপীয়, আর কালো অর্থাৎ পৃথিবীর আর সকল জাত।

সে যাই হ'ক আমাদের, ভারতীয়দের এই কালো চামড়ার জন্য লাঞ্ছনা ভোগ করা বড় কষ্টকর লাগে। একে দেশের আত্মীয়স্বজন সকলকে ছেড়ে এসেছি, মন এমনিই খারাপ—এ অবস্থায় লোকে চায় একটু স্নেহ, একটু মিষ্ট ব্যবহার, একটু আপন-করে-নেওয়া ভাব। কিন্তু তার বদলে যখন পাই, কেবল নীরব উপেক্ষা নয়, স্পষ্ট অনাদর এবং অপমান, তখন মনে সত্যই বড় ব্যথা লাগে। বিশেষ করে তা'দের কালো বর্ণের প্রতি বিদ্বেষটি এতই সুস্পষ্ট যে সেটা ভুলে থাকার

জো থাকে না। 'বাস্'এ উঠ্‌লে যে বেঞ্চে বস্‌ব, সে বেঞ্চে অন্য জায়গা খালি থাক্‌তে কেউ বস্‌বে না। 'টিউব রেলে' চড়্‌ব, সেখানেও সেই আচরণ। রাস্তায় চল্‌ব, দশজনের দৃষ্টি আমাদের ওপর পড়্‌বে। কেউ কেউ শুধু কৌতূহলী দৃষ্টি দেখিয়েই ক্ষান্ত হ'ন না, অদ্ভুত মুখভঙ্গী বা শব্দ করে আমাদের প্রতি সমাদর জানিয়ে দেন। খবর কাগজে দেখলাম, কোন বাড়ীতে 'বোর্ডার' নেবে, জায়গা খালি আছে, সে বাড়ীতে গিয়ে গৃহকর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর আসে—'অত্যন্ত দুঃখিত, এই মাত্র জায়গাটি ভর্ত্তি হয়ে গেছে।' কেউ কেউ একটু বেশী রকম সত্যবাদী, তাই অপ্রিয় সত্যও ঢাকা উচিত মনে করেন না—উত্তর দেন—'আমরা কালো আদ্‌মি রাখি না।' সেখানে যেখন বাস করি, প্রতি মুহূর্ত্তটি যেন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—আমি কালা আদ্‌মি, আমি এদের থেকে ভিন্ন, এরা বোধ হয় আমাকে ঘৃণা করে। এমনি সে দেশে সামান্য বর্ণের পার্থক্যের জন্য পদে পদে লাঞ্ছিত হ'তে হয়।

অনেক ভারতীয়ের সব থেকে দুঃখ হয় এই কথা ভেবে যে বিলাতী লোকেরা হয়ত তা'দের নিগ্রোই ভেবে বস্‌ল। তা'দের ভয়ানক ইচ্ছে করে, জানিয়ে দেয়—তা'রা নিগ্রোদের থেকে ফরসা, তা'দের নাক নিগ্রোদের থেকে টানা, ঠোঁট তা'দের থেকে পাতলা, চুল তা'দের কোঁকড়া নয় ও

ভারতীয়দের ইতিহাস আছে, তা'রা সভ্য জাতি, কিন্তু নিগ্রোরা একেবারে জংলী।

কিন্তু হায় রে, ঠোঁটের পার্থক্য বা নাকের পার্থক্য বা চুলের পার্থক্য ও এদেশীয়দের চোখে ঠেকে না। তা'দের চোখে ঠেকে বড় করে ভারতীয়দের কালো রঙ এবং তা' হ'তে তা'রা অনুমান করে নেয়, তা'রা ব্ল্যাকি এবং নিগ্রোর সামিল। তা ছাড়া ভারতীয়রা যে সভ্যতায় কতখানি উন্নত, তা'র খবর খুব কম লোকেই রাখে।

কাজেই তা'দের দিনরাত্রি ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়, এই বুঝি আমাদের নিগ্রোই ভেবে বস্‌ল। নিগ্রোর পাশে তাই যাব না, যে ভারতীয় কালো তা'কে এড়াব, কি জানি হয়ত তা'কে নিগ্রো ভাব্‌বে, সেই সঙ্গে আমাকেও—এই হ'ল মনোভাব। যার একটু রঙটা ফরসা, সে স্পেনীস ধরণে দাড়ি রাখ্‌বে আর ইটালী ধরণে চুল কাট্‌বে—যদি সৌভাগ্যক্রমে তা'দের দক্ষিণ ইউরোপবাসী ভেবে ব'সে ওরা দয়া করে সাদা আদমি শ্রেণীভুক্ত করে নেয়। দুটো ঘটনার কথা এই সম্পর্কে আমার মনে পড়ে গেল। সে দুটি পাঠকাকে উপহার না দিয়ে থাক্‌তে পার্‌লাম না। আর কিছু না করুক, তারা তাঁকে কৌতুক দান কর্‌বে—একথা জোর করেই বল্‌তে পারি।

রণেনের রঙটা ছিল ফরসা, তাই তা'র ভরসাও ছিল কেউ

তা'কে ভারতীয় হয়ত ভাবতে পারে, কিন্তু নিগ্রো কখনই ভাববে না।

সে গিয়াছিল এক "ওয়াটারিং প্লেস্"এ বেড়াতে, সমুদ্রের ধারে বালির ওপর। আশেপাশে অনেক ছোট ছেলেমেয়ে খেল্‌ছে। সেই ছোট ছেলেদের সঙ্গে খেল্‌তে তা'র ভারি সখ হ'ল। তাই একগাদা টফি ও চকোলেট কিনে তা'দের বিলোতে লাগ্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তা'দের সঙ্গে বন্ধুত্ব বেশ জমে উঠ্‌ল। খুব আলাপ চল্‌ছে।

কাছেই কয়েকটি লোক সমুদ্রের জলে সাঁতার কাট্‌ছিল। তাই দেখে একটি নবপরিচিতা মেয়ে তা'কে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"তুমি কি সাঁতার কাট্‌তে জান?"

সে খুব আগ্রহের সঙ্গে উত্তর দিলে—"জানি বৈকি।"

মেয়েটি আব্দার ধর্‌ল এই বলে—"ডু সুইম্; আই উড্ লাভ্ টু সি এ নিগার সুইম।"

শচীন সম্পর্কিত ঘটনাটি একটু স্বতন্ত্র ধরণের। সে ছিল আরও ফরসা, তাই তা'র ভরসাটা ছিল আরও উঁচু যে নিজেকে একেবারেই ইউরোপীয় বলে প্রচার কর্‌তে পার্‌বে।

যেদিন তা'র ল্যাণ্ডলেডি কথায় কথায় বলেছিলেন—"দেখো, তোমাকে ভারতীয় মনে হয় না, মনে হয় ফরাসী"—সেদিন সে কথা শুনে তা'র বুকটা ফুলে দুই ইঞ্চি বড় হয়ে

উঠেছিল এবং তা'র চেয়ে সুখী লোক বোধ হয় পৃথিবীতে সেদিন কেউ ছিল না।

সেদিন হ'তে সে সঙ্কল্প করল ভারতীয়দের সাথে সে কখনও পথে-ঘাটে বেড়াবে না। সাবধান হওয়াই ভাল, লোকে ফরাসী না ভেবে তাকে যদি ভুল করে ভারতীয়ই ভেবে বসে। তাই ভারতীয়দের সঙ্গে যদিই বন্ধুত্বের খাতিরে কখন কোথাও তা'র যেতে হত, সে ঠিক তা'দের সঙ্গে যেত না, যেত পেছনে পেছনে, দু'চার শ' হাত দূরে দূরে। কিন্তু এমনি বিধির নির্বন্ধ যে এহেন সতর্কতা সত্ত্বেও একদিন তা'কে লাঞ্ছিত হ'তে হয়েছিল।

একদিন সকালে সে এইভাবে বন্ধুদের সঙ্গে চলেছে। অর্থাৎ বন্ধুরা দল বেঁধে আগে চলেছে, সে তা'দের পেছনে একা একা এক শ' দেড় শ' হাত দূরে চলেছে। মনে তা'র অটল বিশ্বাস, তা'কে কেউ সাদা বই কালা আদ্‌মি ভাব্‌বে না।

একটি ছেলে সেই পথেই সাইকেল করে যাচ্ছিল, তা'র কি খেয়াল হ'ল জানি না, শচীনের সামনে দাঁড়াল, তা'র মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাইল, তারপর বল্‌ল—"হ্যালো ব্ল্যাক, ইউ লুক লাভ্‌লি।"

এমনি করে হাজার সাবধান হওয়া সত্ত্বেও সাদা ভারতীয়েরাও তা'দের চোখে কালো আদ্‌মিই গণ্য হয়ে থাকে।

এ বিষয়ে একটা লক্ষ্য কর্‌বার বিষয় এই যে ইউরোপীয়রা তা'দের কালো ভাব্‌ল, কি সাদা ভাব্‌ল, তা' নিয়ে ভারতীয়দের মাথা-ঘামান কেন? নিছক সৌন্দর্য্যের দিক হ'তে সাদা রঙ্‌ ভাল, কি কালো রঙ্‌ ভাল সে বিষয়ে কোন চরম মীমাংসা হয় নি। দুধের সাদা রঙ যেমন কবির চোখে প্রিয়, মেঘের কালো রঙ্‌ তার চেয়ে কিছু কম নয়। বুদ্ধির প্রখরতা দানেও যে ভগবান বর্ণের পার্থক্য হিসাবে কোন পক্ষপাতিত্ব করেছেন তাও ত নয়। মানব-সভ্যতার বিকাশে সাদা জাতির চেয়ে কালো জাতির দান কোন অংশে কম নয়। কৃষ্ণবর্ণ কবি কালিদাস জগতের কোন কবির থেকে নীচু ন'ন।

একথা যখন জানি তখন ইউরোপীয়রা আমাদের কালো বল্‌ল কিনা এবং সেই সঙ্গে নিগ্রো জাতির সামিল করে বস্‌ল কিনা, সে নিয়ে আমাদের এত মাথা ঘামাবার দরকার কি? তা'রা যদিই তা ভেবে বসে, তার জোরে ত আমরা বদ্‌লে গেলাম না। তবু যে এই রকম হয়, তার মানে কি এই নয় যে আমরা মনে মনে ইউরোপীয়দের খুব বেশী খাতির করি?

কোন নূতন কবি কবিতা লিখে ভাবে না—রামা শ্যামা বা পঁচা তা'র কবিতা পড়ে ভাল বল্‌ল কি খারাপ বল্‌ল। তা'রা খারাপ বল্‌লেও কিছু এসে যায় না। কিন্তু সে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে থাকে শোন্‌বার জন্য, রবিবাবু কি বল্লেন। আমরাও সেই রকম ইউরোপীয়দের রবিবাবুর মত উচ্চ স্থান দিয়ে বসি

না কি? নিগ্রো আমাদের কি বল্‌লে, বা চীনেরা আমাদের কি বলে, তা নিয়ে আমরা একটুও মাথা ঘামাই না। কিন্তু ইউরোপীয়রা আমাদের যদি বলে 'ব্ল্যাকি'—আমাদের যেন একূল-ওকূল দু'কূল হারিয়ে যায়। ইউরোপীয়রা আজ যদি জগতের শীর্ষস্থানীয় না হ'য়ে নিগ্রোরা তাই হ'ত, আমরা বোধ হয় তাঁদের কথায় এতখানি নাচতাম না। আমরা বোধ হয় তখন রঙকে ঘসে মেজে ফর্সা করতে চেষ্টা না করে কয়লা বা আলকাতরা মেখে কালো হতে চেষ্টা কর্‌তাম। এ দুর্ব্বলতা আমরা যদি কাটিয়ে উঠতে পারতাম, আমাদের ভাগ্যে অনেক দুর্ভোগ ক'মত।

বৈজ্ঞানিকের মতে চামড়ার রঙের কারণ হচ্ছে চামড়ার পর্দ্দার নীচে পিগ্‌মেণ্ট বা বর্ণবিশিষ্ট কণা থাকার জন্য। চামড়ার নীচে যত এই রকম পিগ্‌মেণ্ট থাক্‌বে ততই মানুষের রঙ্‌ সাদা হতে ক্রমশঃ কালো এবং ঘন কালোয় দাঁড়াবে। এই কণাগুলির যে প্রকৃতির খেয়াল বশেই উৎপত্তি হয়েছে তা নয়, তাদের একটি বিশেষ কাজও আছে। সে কাজ হ'ল রৌদ্রের তাপ হ'তে দেহকে রক্ষা করা। সেই কারণে যেখানেই রৌদ্রের তাপ বেশী, সেইখানকার লোকদের চামড়ার তলায় পিগ্‌মেণ্ট জন্মায় এবং তাঁদের দেহের চামড়াকে কৃষ্ণবর্ণ দান করে। এই জন্যই আমরা দেখি যে বিষুবরেখা পৃথিবীর যে সব স্থান দিয়ে গিয়েছে সেখানকার লোকদের

গায়ের রং সব থেকে বেশী কালো। তার কারণ সে সব জায়গায় সূর্য্যের উত্তাপ সব থেকে বেশী প্রখর। বিষুব-রেখাকে পেছনে রেখে আমরা যত উত্তর দিকে এগোই ততই মানুষের চামড়ার রঙ্ পাতলা হতে থাকে এবং একেবারে উত্তর ইউরোপে মানুষের রঙ্ একেবারে তুষারের মত সাদা হয়। যে দেশ মরু প্রদেশের যত নিকটবর্ত্তী সেই দেশ তত ঠাণ্ডা এবং সেই একই কারণে সে দেশে সূর্য্যের আলোর প্রখরতা কম। একেবারে তুষারের মত শাদা রঙ্ই নাকি মানুষের স্বাভাবিক রঙ্, কারণ সেখানে এক কণা মাত্র পিগ্মেণ্ট নাই। এই কারণে ইউরোপীয়েরা অন্য দেশের লোকদিগকে 'কালার্ড' বা বর্ণবিশিষ্ট বলে।

মানুষের বর্ণের পার্থক্যের জন্য সূর্য্যের উত্তাপই যে সব থেকে বেশী দায়ী তার আরও প্রমাণ আছে। ইউরোপীয়রা যখন গরম দেশে আসে, তাদের চামড়া গরমে তাম্রাভ হয়ে যায়। আমাদের মত গরম দেশের লোক যদি অনেক দিন ধরে ঠাণ্ডা দেশে বাস করে আসে, তা' হ'লে তা'র রঙ্ও একটু ফর্সা হয়। যদি ঠাণ্ডা দেশের লোক হাজার হাজার বছর ধরে গরম দেশে বাস করে, সে হয়ত ক্রম বিবর্ত্তনের নিয়ম অনুসারে কৃষ্ণবর্ণ হবে। অন্ততঃ হওয়াটা খুব সম্ভব।

তাই যদি হয়, তা' হ'লে বর্ণের পার্থক্য জিনিষটা খুব সহজ হয়ে গেল। বর্ণ তা হ'লে ত আর বুদ্ধি বা সভ্যতার

মাপকাঠি রইল না, বর্ণ মাত্র চামড়ার জিনিষই হয়ে রইল ; তার বেশী প্রাধান্য তাকে দেবার কোন দরকার রইল না। তবু যে কেন বিভিন্ন দেশের মানুষের সহজভাবে মেলা মেশায় এই বর্ণ জিনিষটি এত বড় ব্যবধান হয়ে প্রকাশ হয় এবং এতখানি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, সেইটাই ভাব্‌বার বিষয়। রঙের কথাটা ভুলে গিয়ে আমরা কেবল মনুষ্যত্বের দাবীতেই কি পরস্পরের সঙ্গে মিশ্‌তে পারি না ? তা হলে কালোয় ধলায় মিলন ও প্রীতি, সারা জগতের সকল মানুষের সঙ্গে প্রীতি এবং শান্তি স্থাপন কতখানি সহজসাধ্য জিনিষ হয়ে পড়ে। কবে আমরা অন্তরের এই নীচতাকে দূরে ঠেলে বর্ণ-ভেদের উপরে উঠ্‌তে পার্‌ব, যখন কবির কথা সত্য হবে—

'কালো ও ধবল
বাহিরে কেবল,
ভিতরে সবারই সমান রাঙা।'

সে কথা কেউ বল্‌তে পারেন কি ?

পাঁচ

এই ক'মাস ধরে ইংরেজকে যা দেখেছি, তাতে এই মনে হ'য়েছে যে এদের মত আত্মসমাধিস্থ জাতি জগতে আর দু'টি নেই। এরা প্রত্যেকে নিজের চারিদিকে যেন একটা গণ্ডি সৃষ্টি ক'রে তার মাঝখানে নিজেকে রেখে দেয়। সকলের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ হ'তে এইরূপে এরা বিচ্ছিন্ন। এরা যেন কচ্ছপ-ধর্ম্মী, অন্য কাহারও সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে পরাঙ্মুখ, দূর হ'তে দেখ্‌লেই লজ্জাবতী লতার মত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, সংস্পর্শে আসা ত দূরের কথা।

এরা পাশের বাড়ীতে কে থাকে তার খোঁজ ত রাখেই না, এমন কি উপর তলায় বা পাশের ঘরে কে আছে তারও অনেক সময় কোন খোঁজ রাখে না। 'বাস'এ বা টিউব্ রেলে দেখি, সারি সারি লোক বসে আছে, কিন্তু কখনও

কোন যাত্রী অন্য কোন যাত্রীর সঙ্গে গল্প বা আলাপ করে না; প্রত্যেকের হাতে একখানি করে বই বা খবরের কাগজ এবং সেই দিকে চোখ ছ'টি নিবদ্ধ, আশে-পাশে কে বস্‌ল বা কে কি কর্‌ল—সে দি[illegible]ক্ষেপও থাকে না; এমনি আলাপে বিমুখ জাত এরা!

আমাদের দেশ ত ঠিক একেবারে তার উল্টো। গাড়ীতে উঠ্‌লে কত গল্পগুজব আমরা শুনি। একান্ত অপরিচিত হ'লেও পাশের যাত্রীদের সঙ্গে কথা বল্‌তে আমরা বাধ্য হই। সেও কি যে-সে আলাপ! কোথায় থাক, কি কর হ'তে আরম্ভ করে চৌদ্দ পুরুষের আলোচনা না হ'য়ে নিষ্কৃতি নেই। আর এখানে সহযাত্রী বা প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলাটাই যেন অসঙ্গত। যদিবা নিতান্ত পরিচিত কেউ চোখে পড়ে, তা'র সঙ্গে বেশী দূর আলাপ গড়াবার জো নেই। নমস্কারের পরেই হবে আবহাওয়ার কথা। দিনটা ভাল, কি মন্দ—এই ধরণের যা হয় একটা কিছু এবং এইখানেই আলাপের শেষ। ব্যক্তিগত প্রশ্ন সেখানে যেন একেবারেই ভদ্রতার গণ্ডির বাইরে। তাই সব থেকে যা সাধ[illegible]। বিষয় তাই নিয়েই হ'বে আলাপ।

এদের আচার-ব্যবহারগুলোও যেন এদের এই আত্ম-নিবিষ্টতার প্রভাবে উদ্ভূত হয়েছে। সকলের সঙ্গে একটা বাহ্যিক ভদ্র আচরণের ভাব রক্ষা করে যাওয়াটাই

মুখ্য উদ্দেশ্য, ভিতরের ভালবাসা বা আন্তরিক স্নেহের পরিচয় দেবার যেন কোন দরকার নেই। এজন্যই এদের আচার-ব্যবহারের নিয়মগুলি অন্য ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ হতে বর্ম্মস্বরূপ এদের বাঁচিয়ে রাখে।

ঠিক এই কারণেই মৌখিক ভদ্রতায়ও এরা বোধ হয় পৃথিবীর সকল জাতির অগ্রগণ্য। কথায় কথায় 'ধন্যবাদ দেওয়া ত আছেই, কোন লোকের সঙ্গে পরিচিত হলেই বলা চাই—'তোমায় দেখে অত্যন্ত খুসী হয়েছি',—মনে মনে খুসী হই বা না-ই হই। কোন দোকানে গিয়ে সামান্য কিছু জিনিষ কিন্‌লেই দোকানদার এসে বলে যায়—'মাচ্ অব্‌লাইজ্‌ড্ স্যার্'। কৃতার্থ যদি হতেই হয় ত এক্ষেত্রে দু'পক্ষই হয়েছে, তবু ভেবে পাওয়া যায় না এতখানি অত্যুক্তির প্রয়োজন কি। আমি এমনও দেখেছি যে রোগী স্বামী বিছানায় শুয়ে, স্ত্রী এসে তাঁকে এক গ্লাস জল খেতে দিয়েছেন, সে ক্ষেত্রেও স্বামী স্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। সেখানেও কি ধন্যবাদের প্রয়োজন ছিল! এ রকমের মৌখিক ভদ্রতা যেন আমাদের ঘনিষ্ঠভাবে মেলা-মেশার অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ-স্থাপনে বিরোধী হ'য়ে দাঁড়ায়।

এই ত গেল এক দিক, কিন্তু এর একটি সুন্দর দিকও আছে। এই বাহিরের কঠিন অবহেলার আবরণকে ভেদ

ক'রে কেউ যদি তা'দের সঙ্গে মিশ্‌তে পারি, তা'হলে পরিচয় পাই সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। তখন দেখি, বাহিরে যতখানি নির্ব্বিকার এবং হৃদয়হীন বলে মনে হয়েছে, আসলে যেন এরা তা নয়; আপন হ'তে, একেবারে আত্মীয়ের মত হ'তে, এরা যেমন জানে—আর কোন জাতিই বোধ হয় তেমন জানে না।

তারই প্রমাণ স্বরূপ আজ আমি এক ইউরোপীয় মহিলার পরিচয় এখানে দেব। সেই 'সাত সমুদ্র তের নদী'র পারের দেশে, যেখানে আত্মীয় বল্‌বার কেউ ছিল না, আপন জন কাউকে পাবার এতটুকু আশাও ছিল না, সেখানে কেমন করে এক দিদি লাভ করেছিলাম, সে দিদি আমার কতখানি স্নেহশীলা, আর কতখানি আপন হয়েছিলেন, সেই কথাই লিখ্‌ব।

নাম তাঁ'র মিসেস্ জন্‌সন্। ইংরেজের মেয়ে হ'য়েও, এবং ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান তাঁ'র আয়ত্ত থাক্‌লেও ভারতীয় সভ্যতা আর ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি তাঁ'র শ্রদ্ধা ছিল প্রগাঢ়। সেই শ্রদ্ধায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। শুধু শিক্ষা করেই ক্ষান্ত হন নি, ভারতবর্ষে এসে বিশ্বভারতীতে কিছু দিন থেকে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন। বিলেতে ফিরে গিয়েও তিনি বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা কর্‌তেন

এবং সে বিষয়ে তাঁ'কে সাহায্য কর্‌বার জন্য তিনি একটি বাঙালী খুঁজ্‌ছিলেন। সেই সম্পর্কেই তাঁ'র সঙ্গে আমার পরিচয়।

সে দিনটি বেশ মনে পড়ে—বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন তিনি করেছিলেন। এই নিয়েই প্রথম সূত্রপাত। তারপর তিনি তাঁ'র বাড়ীতে আমায় নিমন্ত্রণ করেন এবং পরে ঠিক হয় তিনি নিয়মিত আমাকে ফরাসী শেখাবেন এবং আমি তাঁ'কে বাংলা পড়াব। তাঁ'র বাড়ীতে কাটান সেই দিনগুলিই আমার প্রবাস-জীবনের এক মাত্র সুখের স্মৃতি। সে-বাড়ীতে যখন থাক্‌তাম, তখন মনে হত না যে আমি বিদেশে, ঐ কয়েক ঘণ্টার জন্য আমি যেন আমার দেশে আত্মীয়ের বাড়ীতেই আছি।

আমার 'রাঙাদি' বিলাতি মেম হলেও তাঁ'র বাড়ীতে ভারতীয় অনেক কিছু জিনিষ আছে। একটি আলাদা ঘর আছে, সেখানে শুধু ভারতীয় জিনিষই থাকে; আলমারি ভর্ত্তি বাংলা এবং সংস্কৃত বই আছে, এক পাশে আছে এস্রাজ, সেতার ইত্যাদি, অন্য পাশে আছে সাড়ি নাগ্‌রা। সে ঘরের দেয়ালে ভারতীয় ছবি এবং কলের গানের জন্য বাক্স বোঝাই বাংলা রেকর্ড। দেখে মনে হয়, এ কোন ভারতীয়েরই ঘর হবে বা। এইগুলি পরিচয় দিয়ে দেবে ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁ'র কত গভীর।

আমার অভ্যর্থনায়ও তাঁর বিশেষত্ব ছিল। যেহেতু আমি তাঁ'র বাঙালী ছোট ভাইটি, আমাকে তিনি বাঙালী দিদি হ'য়েই অভ্যর্থনা করতে ভালবাসতেন। আমি প্রবাসী, আমি আত্মীয়-স্বজনের স্নেহও পাই না; আর তিনি দিদি কিনা —তাই আমার এ অভাব পূরণ করতে তিনি বদ্ধপরিকর। আমি যেদিন যেতাম সেদিন তিনি ভারতীয় রান্নারও ব্যবস্থা করতেন। ভারতীয় রান্না ত তিনি জানেন না, তাঁ'র ভাইটিও কোন দিন রান্নাঘরের ধার মাড়ায় নি; তবু আমরা দুজনে মিলে, অশিক্ষিত অপটু হস্তে ভাত-তরকারী যা কিছু রান্না করতাম, তাই খেতাম,—কাঁটা-চামচ দিয়ে নয়, হাত দিয়ে। ভাইটির খাতিরে 'রাঙাদি' সেদিন সম্পূর্ণ ভারতীয় ব'নে যেতেন। বাংলায় কথা বলতেন, এমন কি ধন্যবাদটিও দিতে তিনি ভুলে যেতেন।

তাঁ'র স্বামীকে ভারতীয় রান্না খাওয়ানর জন্য তাঁ'র কি উৎসাহ। অপটু হাতের রান্না, বড় সুবিধার হয় নি, তাঁ'র বড় ভাল লাগে না, তবু বাধ্য হয়ে তাঁ'কে খেতে হয় —'রাঙাদি'কে সুখী করবার জন্য এবং আমাকে উৎসাহ দেবার জন্য!

প্রবাস-জীবনে 'রাঙাদি' ছিলেন সত্যই আমার আপন দিদি। আপন বললেও ঠিক তাঁ'র মর্যাদা রক্ষা করা হ'বে না, আপন হ'তেও তিনি ছিলেন আপনতর। আমার আপন

দিদি আমার স্বজাতীয়া, তাঁ'র সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ আছে ; তিনি হৃদয়ের সহজ টানেই আমার প্রতি ভালবাসা দেখান। কিন্তু এখানে আমরা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির লোক, এমন কি বিভিন্ন সভ্যতায় বর্দ্ধিত। এতগুলি বাধা অতিক্রম করেও যেখানে স্নেহ এমন গভীর ভাবে বয়, সেখানে একটি অতি মহান্ হৃদয়ের দরকার নয় কি? শুধু স্নেহই নয়, সেই স্নেহকে ঠিক আমারই স্বদেশের মত করে আমার প্রতি প্রবাহিত করার চেষ্টার মধ্যে আরও উদার হৃদয়ের পরিচয় পাই না কি? এত দিন পরেও আমার সেই 'রাঙাদি'র কথা মনে হ'লে মাথা আপনি শ্রদ্ধায় নুয়ে আসে ; তাঁ'র লেখা চিঠিগুলি যখন দেখি হৃদয় আবেগে ভরে উঠে।

অনাত্মীয়ের দেশে অনাত্মীয়দের মধ্য হ'তেই অতি আপন আত্মীয় খুঁজে পেয়েছিলাম এবং পেয়েছিলাম যে জাতিকে মনে মনে ভেবেছিলাম—পরুষ কঠোর হৃদয়হীন, তা'দেরই মধ্যে। বাহিরের মুখ ভেতরের মনের অভিব্যক্তি দিতে কতখানি অক্ষম! মুখোস মানুষের আসল মুখকে কতখানি বিকৃত করতে পারে তা বেশ হৃদয়ঙ্গম করেছি।

রুডিয়ার্ড কীপ্‌লিং একজন মস্ত বড় লেখক হয়েও একথা বলেছেন যে, 'প্রাচ্য আর প্রতীচ্য এ দু' জগতে মিল হওয়া অসম্ভব, কারণ প্রাচ্য হ'ল প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য হ'ল প্রতীচ্য'। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তিনি ভারতবর্ষেই জন্মেছিলেন

এবং ভারতবর্ষে অনেক কাল বাসও করেছিলেন, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য দুইকেই চেনবার সুযোগ ও অবসর তাঁ'র যথেষ্ট মিলেছিল। এক্ষেত্রে হয় তিনি ব্যঙ্গ করেছিলেন, নয় বল্‌তে হয়—মানব-চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা তাঁ'র সুস্পষ্ট নয়।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের ডোর যে আগে হ'তেই বাঁধা হয়ে গেছে, তা যিনি দু'চোখ খুলে চলেন, তাঁ'র চোখেই ধরা প'ড়ে যায়। আমাদের এই ত এতটুকু ক্ষুদ্র এক জগত, তাও মানুষের বুদ্ধিগুণে এবং বিজ্ঞানের বলে অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। জগতে যে কটা জাতি বাস করে, তাদের ত হাতের ডগায় গোণা যায় রেল, মোটর, এয়ারোপ্লেনের কল্যাণে দশ জায়গার মানুষের পরস্পরের সংস্পর্শে আসবার সম্ভাবনা দশগুণ বেড়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে মিলনের পথ ত অতি সুপ্রশস্ত। আর কিছু সম্বন্ধ না থাকুক, আমরা সকলেই ত একই পৃথিবীর বুকে মানুষ এবং একই ভগবানের সন্তান। চামড়ার রঙের পার্থক্য, অর্থাৎ জাতিগত পার্থক্য এবং রাজ-নৈতিক স্বার্থ-সংঘর্ষ তাদের অন্তরায় আছে—তা জানি। কিন্তু তাদের রাজত্ব ত চিরকাল অটল রইবে না। মানুষের হৃদয় বলে এক জিনিষ আছে, সে কথা কি সে চিরকাল ভুলে থাক্‌তে পার্‌বে?

এখনও ত মানুষ তার হৃদয়ের কথা ভুলে থাক্‌তে পারে না। হৃদয়-বৃত্তিকে সবার ওপরে স্থান দিতে সে এই যুগেই

পারে এবং দেয়। তা না হলে আমার 'রাঙাদি'র মত চরিত্র সম্ভব হয় কি করে? এঁরাই ত হলেন সেই ভাবী যুগের অগ্রদূত, যাঁরা জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রেমের জয়ের মন্ত্র প্রচার করে বেড়ান। এমন একদিন কি আসবে না, যে দিন অনুকূল হাওয়া বইবে, এবং এই মন্ত্র কোটি কোটি মানবের কাণে গিয়ে মরমে পশে তাদের এই নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলবে? মানুষের হৃদয় আছে, আর সে হৃদয়ে আছে প্রেম সঞ্চিত হয়ে,—সে মহামিলনের দিন ত সুদূরে থাকতে পারে না।

ছয়

আজকাল শীত খুব এগিয়ে এসেছে, আর দিনগুলোও হয়েছে ভারি ছোট। আগে রাত দশটায় রাত্রি নাম্‌ত, এখন পাঁচটায় নামে; আর দিনকতক বাদে বিকাল তিনটায়ই সব অন্ধকার হয়ে যাবে। প্রথম যখন এসেছিলাম তখন যে শীত পেয়েছি, সেই হ'ল আমাদের দেশের পৌষ মাসের শীত। তারপর ত ক্রমশঃ বেড়েই এসেছে এবং এখনও নাকি অনেক বাড়্‌বে। এখনই রাত্রে গোটা-তিনেক কম্বল দরকার, গরম জলের একটা ব্যাগ সঙ্গে থাকলেও মন্দ লাগে না। পরে আরও কি আয়োজনের দরকার হবে, তা কল্পনা করতে পারি না।

এই সঙ্গে বর্ষার প্রকোপও বেশ বেড়ে চলেছে। এমনিই ত এ দেশে বছরের বার মাসের মধ্যে দশ মাস বৃষ্টি।

গরম কালেই মেঘমুক্ত আকাশ এবং সূর্য্যের মুখ দেখা দৈবাৎ ভাগ্যে থাক্‌লে ঘটে। তারপর যেমন শীত পড়তে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে আকাশ তার গায়ে কটা রঙের মেঘের পর্দ্দা টেনে দেয়। সে পর্দ্দা শীতের প্রথম দিকে যদি বা দু'এক দিন খোলে, শীত একটু জমে এলে কোন দিনই তা ওঠে না, বরং সে পর্দ্দা ঘন হতে ঘনতর হয়ে কালোটে রঙ ধারণ করে।

মেঘের এমন ঘনঘটা হলেও এ দেশের আকাশ যেন তেমন করে বর্ষণ কর্‌তে জানে না; এ দেশের মেঘে কেবল একঘেয়ে একটানা টিপ্‌ টিপ্‌ করে বৃষ্টি হয়, আমাদের দেশের মত আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা কোন দিন নাম্‌তে দেখি নি। এ দেশের আকাশ ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করেই কাঁদে, প্রাণ খুলে কাঁদ্‌তে জানে না। ভরা বর্ষার দিনে মানুষের মন যে মাধুর্য্যে আপ্লুত হয়, সে মাধুর্য্য এখানে মেলে না। এ বর্ষা মনের ওপর বিষাদের ছাপ বুলিয়ে দিতে জানে, তাকে আলোড়িত কর্‌তে জানে না।

বছরের বার মাসের বেশীর ভাগই যেখানে এই ভাবে কাটে, সেখানে মনে আপ্‌না হতেই যেন একটা বিষাদের ভাব ফুটে ওঠে। আমাদের মত ঘর-ছাড়া দেশ-ছাড়াদের মনে ত সে সুরটা আরও বড় করে বাজ্‌বে।

এই সঙ্গে যখন গাছগুলো তাদের পাতার বাহার খসিয়ে

দিয়ে রিক্ত হয়ে তাদের কালো কালো গাগুলো মেলে দিয়ে দাঁড়ায়, তখন দৃশ্য হয় আরও করুণ। মনে হয়, প্রকৃতির দেহে যেন প্রাণ নেই, প্রকৃতির যেন মরণ হয়েছে ; তাই যেন ঘাসগুলো মরে হয়ে গিয়েছে ফ্যাকাসে, আর গাছগুলো সর্ব্বহারা সন্ন্যাসীর মত রুক্ষ গা মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আকাশও মুখ ভার করে কান্না সুরু করে দিয়েছে।

দেশের শীতকালের সঙ্গে এ শীতকালের অনেকখানি তফাৎ। দেশের শীতকালে প্রকৃতির শোভা একটুখানি ক্ষুণ্ণ হয় মাত্র, গাছের পাতায় বার্দ্ধক্যের রঙ্ ধরে, দু-এক দিন কুয়াসা নামে, এই মাত্র। কিন্তু এখানে শীতকালে প্রকৃতি যেন একেবারে মরে যায়, পড়ে থাকে তার নিরাভরণা সর্ব্বহারা দেহখানি। সে নিৰ্জ্জীবতার মাঝখানে বাস ক'রে বুকে যেন হাঁপ ধরে, প্রাণ যেন কেঁদে ওঠে, মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়, কবে এই সৃষ্টিছাড়া দেশ হ'তে পরিত্রাণ পাব।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে যাদের এদেশে বাস, তারা এই *নিৰ্জ্জীবতার জন্য এতটুকু অনুযোগ করে না*, বা তা নিয়ে এতটুকু মাথাও ঘামায় না। তারা তাদের কাজ নিয়ে, আমোদ-প্রমোদ নিয়ে ব্যস্ত। থিয়েটার বায়স্কোপে ভীড়ও তার জন্য কিছু কমে না, কারও মুখের হাসিও সে জন্য ম্লান হয় না।

তা'রা বলে,—জীবনটা আমাদের হয়েছে কাজের জন্য, আর ভোগের জন্য। বাহিরের আকাশ যদি মুখ ভার করে কান্না সুরু করে, তা নিয়ে আমরা মন খারাপ কর্‌ব কেন? মূল্য-বান সময়ের এমন অযথা অপব্যবহার তারা কিছুতেই সহ্য কর্‌বে না, এই হ'ল তা'দের প্রতিজ্ঞা। বাহিরের প্রকৃতি অনুকূল হ'ক, প্রতিকূল হ'ক, জীবন-তরী আমরা যে ভাবে বাইতে চাই সেই ভাবেই বেয়ে যাব; বাহিরের জগৎকে আমরা এতখানি আধিপত্য দেব কেন, যে তা'দের প্রতিকূলতা দেখে—আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে? প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ত দাসত্বের নয়—প্রতিদ্বন্দ্বিতার; পরাজয়ের নয়—বিজয়ের। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির প্রতিনিয়তই যুদ্ধ চলেছে এবং সে যুদ্ধে মানুষ জয় লাভ কর্‌বে, এই হ'ল বিধাতার বিধান, বিশ্বরহস্যের অন্তর্নিহিত অভিসন্ধি।

কাজেই কথাটা দাঁড়াল এই যে পুরুষকার বড়, না দৈব বড়।

আমরা যে দেশে মানুষ, সে দেশের লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধা ষোল আনা দৈবের ওপর, কারণ এ মনোভাব আমাদের দেশের হাওয়ায় বাতাসে ছড়ান আছে। আমাদের দেশে লোকে হাওয়া ও আলো পায় প্রচুর, অতি গ্রীষ্ম বা অতি শীত কা'কে বলে তা জানে না। অন্নের জন্য পরিশ্রম করতে হয় না, ভূমি এমন উর্ব্বর যে বীজ ফেল্‌লে শস্য আপনি ফলে।

জলের জন্য ভাবতে হয় না, নদী আপনি এসে প্রতি ঘরের দ্বারে দ্বারে জল বয়ে দিয়ে যায়। এমন দেশের লোকে প্রকৃতির প্রতিকূল-আচরণ বড় একটা দেখে নি, তাই প্রকৃতিকে স্নেহশীলা আদরিণী মা বলেই জেনে এসেছে।

আত্মরক্ষা যার করতে হয় না, সে অনভ্যাসের গুণে আত্মরক্ষার শক্তিও হারিয়ে বসে। জীবন ধারণের জন্য যার কাজ করতে হয় না, সরঞ্জাম যে আপনা হ'তেই ঘরে বসে পায়, সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাঁচবার শক্তি হারিয়ে বসে এবং দৈবের দানের ওপর নির্ভর করেই চলতে শেখে।' আমাদের দুর্দ্দশার কারণই হ'ল তাই। আমাদের দেশ আমাদের কোলে ক'রে আদুরে ছেলে ক'রে, কেবল মানুষই করেছেন, কখনও দশ জনের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচবার সুযোগ দেন নি। আজ তাই আমরা পঙ্গু, পথ চলতে অক্ষম ; আমরা পথের ধারে বসে অদৃষ্টের দানের ওপর নির্ভর করেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, পুরুষকার কা'কে বলে জানি না।

কিন্তু এদেশের লোকেরা দৈবের দানকে শূন্য ধরে নিয়ে পুরুষকারের ওপরই ষোল আনা নির্ভর করে। এরা জানে যা কিছু পেতে হবে, তা সবই আদায় করে নিতে হবে। প্রকৃতি আপনি কিছুই দেন না, তাঁ'র কাছে দস্যুর মতই সব হরণ করে নিতে হয়।

এই মনোভাব কেমন ক'রে হলো, তা'র অনুসন্ধান করতে

হ'লে আমাদের এদেশের আবহাওয়ার কথাটাই নতুন করে তুল্‌তে হবে।

এদের আকাশে সূর্য্য ওঠে না, চাঁদের হাসিও ফোটে না। 'তারালি' রাতের সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্‌বার সুযোগও এদের বড় একটা মেলে না। এদের দেশে শীতের তীব্রতা মানুষের হাড় পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। চুপ করে বসে থাক্‌লে সে শীত যায় না, আরও চেপে ধরে; হাত পা ছুঁড়্‌তে হবে, কাজে ব্যস্ত থাক্‌তে হবে, তবেই সে শীত যাবে। দেশটি সাগর দিয়ে চারি পাশে ঘেরা। সে ক্ষুদ্র দেশের বুকে যা ফসল জন্মায়, তাতে দেশের লোকের সারা বছরের অন্নসংস্থান হয় না। কাজেই মানুষকে সে দেশে বেঁচে থাক্‌বার জন্যে কাজ কর্‌তে হবে, পেটের দায়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে বিদেশ হ'তে খাদ্য আহরণ কর্‌তে হবে।

যে দেশে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে এমন প্রতিনিয়তই যুদ্ধ করে জয়লাভ করে বেঁচে থাকে, প্রতি পদে তার মানসিক বল বেড়ে চলে, আত্মশক্তির ওপর ভক্তি আসে এবং পুরুষকারের ওপর অটল শ্রদ্ধা জন্মায়। তারা এই কথাই তখন বল্‌তে শেখে যে—দৈব ব'লে কিছু নেই, ভাগ্য ব'লে কিছু নেই; যা আছে সবই তোমার মুঠোর মধ্যে, সেটা পেতে দরকার দুখানি কর্ম্মক্ষম হাত, আর অসীম মনের বল—আর কিছুই নয়। যে ছেলে মায়ের কোলে বসে মায়ের স্নেহের

আবরণের মধ্যে মানুষ হয়েছে, বাহিরের জগতের ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে কোনদিন পরিচিত হ'বার সুযোগ পায় নি—এমন গর্ব্বিত বাণী কখনও তা'র মুখ দিয়ে আমরা শুনতে পাব না।

সেই জন্যই ভাবি আসলে ঠক্‌ল কে? সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা চিরস্নেহময়ী মাতৃভূমি পেয়ে আমরা ঠক্‌লাম, না রুক্ষ কঠোর অনুর্ব্বর মা পেয়ে তারা ঠক্‌ল বেশী? মূলধন আমাদের অনেক থেকেও লাভ আমাদের শূন্য এলো, আর মূলধনের ঘরে ওদের শূন্য থেকেও লাভে ওদের ঘর ভরে গেল।

সাত

মানস মুখার্জ্জির সঙ্গে সেদিন কিঙ্‌স্‌ কলেজে পরিচয় হ'ল, পরিচয় মানে আগে হ'তেই কলেজ-জীবনে আলাপ ছিল দেশে, এখানে এসে পুরানো আলাপ ঝালিয়ে নেওয়া হ'ল। আজ বিকেলে তা'র বাড়ীতে চায়ের নেমন্তন্ন।

মুখার্জ্জি ছেলেটি ভারি ভাল। পড়াশুনা ভিন্ন জগতের আর কোন বিষয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্কই সে রাখে না। বি-এ পাশ করে এখানে আই-সি-এস্‌ দিতে এসেছে। দেশের আবহাওয়ার গুণে সে অল্প বয়স হতেই দার্শনিক ভাবাপন্ন ছিল। খেলাধূলায় তা'র বিরাগ। স্কুল-জীবনে বন্ধুরা যখন জোর ক'রে তা'কে ফুটবল মাঠে ধরে নিয়ে যেত, তখন তা'র লক্ষ্য থাক্‌ত বলের প্রতি ততটা নয়, যতটা

আকাশে উড়ে যাওয়া মেঘের প্রতি। বয়স এবং বিদ্যা-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা'র এই মনোভাব বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করেছিল, তাই বি-এ পড়্বার সময় ঠিক ক'রে বস্‌ল সে দর্শনে অনার্স নেবে। দর্শন পড়ে পড়ে সে মায়াবাদের এত ভয়ানক ভক্ত হয়ে পড়্‌ল যে বন্ধুরা তা'র ভবিষ্যৎ ভেবে ভারি ক্ষুণ্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। বাস্তব জগত, দেহ, মন সমস্তকেই যখন সে মায়া বলে উড়িয়ে দিতে চাইত, বন্ধুরা বিরক্তিভরে তা'র পিঠে তু'-একটা ঘুষি দিয়ে বুঝিয়ে দিত যে রক্ত-মাংসের দেহে ব্যথা অনুভূত হয়, তার অস্তিত্ব আছে, সে নিছক মায়া নয়। তা সত্ত্বেও তা'র স্বভাবজ সরলতা ও আন্তরিকতা সকলকে তা'র প্রতি আকৃষ্ট করত।

প্রবাসে লব্ধ তা'র বন্ধু বিরূপ ঘোষ কিন্তু ঠিক উল্টো প্রকৃতির ছেলে। সে যদি উত্তর-মেরু হয়, বিরূপ হবে দক্ষিণ-মেরু। তা'র ধারণা মোটামুটি হ'ল এই যে সুয়েজ খালের ওপারে যা'রা বাস করে, তা'রা অসভ্য, তা'দের না আছে বুদ্ধি, না আছে বিবেচনা। সভ্যতা বলে যদি কিছু থাকে, তা সুয়েজ খালের এপারে যারা থাকে তাদেরই একচেটে। এরা জানে জীবনকে কি করে ভোগ করতে হয়, এরা ত সময় নষ্ট করে না একথা ভেবে ভেবে—যে জীবনটা কি স্বপ্ন না মায়া। এরা জানে দেহকে কেমন করে সুন্দর পোষাকে আবৃত করতে হয়, কেমন করে রসনার তৃপ্তিসাধন

কর্‌তে হয়, কেমন করে পৃথিবীর বুকে স্বর্গ টেনে আন্‌তে হয়।

তাই তা'র ধারণা হ'ল এই যে বিলাতের জীবনে যা কিছু সুখসাচ্ছন্দ্য ভোগ সম্ভব তা' হতে নিজকে বঞ্চিত করে রাখার মতো বোকামি আর কিছু নেই। বিরূপ ঘোষ এখন ভাল ভাল 'সুট্' পরে, মোজার সঙ্গে 'ম্যাচ্' করা 'টাই' আর রুমাল রাখে। মদ্য-আদি সেবনে মোটেই সে দ্বিধা বোধ করে না। মুখার্জ্জির সঙ্গে তা'র যে পরিচয়ের সূত্রপাত তাও তা'র এই অত্যধিক মদ্যের প্রতি আকর্ষণ হেতু।

'বার ডিনার'এ ভোজনের অঙ্গস্বরূপ মদ আপ্‌না হতেই মেলে। মুখার্জ্জি যে মদ খায় না, সে খবরটা জান্‌তে পেরে ঘোষ সেদিন তা'র টেবিলেই ডিনার খেতে বসে গেল; মতলব—নিজের বরাদ্দটা ত খাবেই, মুখার্জ্জিরটারও সে নিজে সদ্ব্যবহার কর্‌বে। পয়সা যখন দেওয়া হয়ে গেছে, সেটা ত এমনি ফেলে দেওয়া যায় না!

সে কর্‌লেও তাই। ফল কিন্তু খুব ভাল হ'ল না। বিলেতে নতুন এসেছে, মদ খাওয়াটা এখনও ভাল দুরস্ত হয় নি, তার ওপর মাত্রা হয়ে গেল বেশী। শীঘ্রই তা'র চাল-চলনের পরিবর্ত্তনে বেশ বোঝা গেল—মাথা তা'র খারাপ হ'তে চলেছে।

মুখার্জ্জি বেগতিক দেখে তা'কে বাড়ী ফির্‌তে রাজী করিয়ে

বাহিরে নিয়ে এল। বাহিরের বাতাস আর ভিতরের ওষুধের গুণে তখন তা'র মনে রঙ্ ধরেছে।

ঘোষ বলে—মুখুজ্জে, সত্যি এটা একেবারে স্বর্গ, পরীর দেশ। কি ভাগ্যি এদেশে এসেছি।

মুখার্জ্জি কোন উত্তর দেয় না।

তা'রা আরও এগিয়ে চলে। ঘোষের পা এঁকে বেঁকে চলে, সে সোজা চল্‌তে পারে না। কিন্তু মনে তা'র ভারি স্ফূর্ত্তি; সে বলে—দেখ ভাই আকাশে কেমন মেঘ করেছে, কিন্তু তারা নেই কেন?

মুখার্জ্জি হেসে বল্লে—আর অত বাজে কথায় কাজ নেই, চল ষ্টেশনে যাই।—এই বলে নিকটতম 'টিউব ষ্টেশন' 'হবর্ণ'এর দিকে তা'কে টেনে নিয়ে যায়।

ঘোষ তা'র হাসি শুনে চটে গিয়ে বলে—বটে, তুমি বুঝি ভাব্‌ছ আমি মাতাল হয়েছি? মদ খেয়ে মাতাল হ'ব এমন ছেলে আমি নই।—এই বলে টলে টলে হেঁটেই দেখিয়ে দিতে চেষ্টা করে—সে মোটেই মাতাল হয় নি।

কথা বল্‌তে বল্‌তে তা'রা হবর্ণ ষ্টেশনের ওপরেই এসে পড়েছে। ঘোষের অকাট্য প্রমাণ দেখিয়ে দিতে ইচ্ছা হ'ল যে সে মাতাল হয় নি। তাই পকেট হ'তে টাকা বার করে টিকিটের কাউন্‌টারের কাছে গিয়ে বল্‌লে—'ওয়ান হবর্ণ প্লীজ্'।—বেচারীর খেয়াল নেই যে, সে যে ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে,

তারই নাম হ'ল হবর্ণ এবং তা'র গন্তব্য স্থান হ'ল 'সাউথ্ কেনসিংটন্'।

এই ভাবে ঘোষকে নিয়ে মুখার্জ্জির সেদিন খুব বিব্রত হ'তে হয়েছিল। কিন্তু এই সূত্রেই উভয়ের মধ্যে পরিচয় ও ও বন্ধুতার সুরু হয়। ফলে তা'রা দুজনে একই ল্যাণ্ডলেডির তত্ত্বাবধানে বাস সুরু করে দিল।

দু'জনের ভিন্ন মত এবং ভিন্ন রুচি, তাই নিয়ে উভয়ের তর্কও বাধে দিবারাত্র ; কিন্তু তা'দের এই আকাশ-পাতাল পার্থক্যই যেন উভয়ের আকর্ষণের মূল।

সেদিন তা'দের বাড়ী যেতেই ঝি এসে দরজা খুলে দিল। মুখার্জ্জি এসে তাদের সিটিং রুমে নিয়ে আমাদের বসাল

শীত পড়ে গিয়েছে। বিকেলেই 'ফায়ার প্লেস'-এ আগুন জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। কয়লার লাল টক্‌টকে আগুন দেখ্‌তে যেমন মনোহর, তাপও দেয় তেমনি বেশী। বাহিরে ঠাণ্ডার মধ্যে ঘুরে এসে আগুন বড় ভাল লাগে। সে যেন তার লাল আভা বিকীর্ণ করে আমাদের তার কাছে আহ্বান করে। যত কাছে যাই তত সুখকর। অসাড় পা দুটো তার কাছে এগিয়ে দিই, বেশ আরাম লাগে। ঠাণ্ডা হাত দুটো আগুনে সেঁকি। আগুণের স্পর্শ যে কত মধুর তা শীতের দেশে বাস না কর্‌লে বোঝা যায় না।

আগুন এদেশে শীতের দিনে সত্যই বড় আপন, শীতের পরিত্রাণ, প্রাণ-দাতা বন্ধু-স্বরূপ।

সে আগুনেরই এক পাশে এক শোফায় বসে ঘোষ পাইপ টান্‌ছে আর ধোঁয়াগুলোকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে ছাড়্‌ছে।

নীচে থেকে কে একজন খবর দিয়ে গেল যে চা তৈরী।

খানিক বাদে আমরা নীচে গেলাম। সেখানে একটি মধ্য-বয়স্ক মহিলার সঙ্গে দেখা হ'ল। অনুমানে বুঝ্‌লুম ইনি তা'দের ল্যাণ্ডলেডি। মুখার্জ্জি পরিচয় করিয়ে দিল, ইনি মিসেস্ ক্লেটন, আর ইনি আমাদের বন্ধু। পরস্পর করমর্দ্দন করে আমরা বসি।

খানিক বাদে ষোল সতের বছর বয়সের একটি মেয়ে এল। ঘোষ পরিচয় করিয়ে দিল—ইনি মিস্ ক্লেটন। নাম তা'র জয়িস।

জয়িস চা ঢেলে আমাদের পরিবেশন করেন এবং তা'র মা রুটি কেটে দেন, আমরা খেতে সুরু করি।

খানিক বাদে জয়িস জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—আচ্ছা, ইণ্ডিয়ার কোন্ অংশে তোমাদের বাড়ী?

ঘোষ বল্‌লে—বাংলা দেশ চেন ত? আমরা সেই বাংলা দেশ হ'তে আস্‌ছি।

জয়িস বল্‌লে—হাঁ চিনি বৈ কি। সেই বেঙ্গল টাইগারের দেশ ত! যেখানে বেঙ্গল টাইগার পাওয়া যায়?

তা'র উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। সে বলে—আমি

চিড়িয়াখানায় গিয়ে বেঙ্গল টাইগার দেখে এসেছি। কী ভীষণ চেহারা, দেখ্‌লে ভয় করে। আচ্ছা তোমাদের দেশে অনেক বাঘ আছে, না ?

আমি বল্‌লাম—হাজার হাজার, সমস্ত সুন্দরবন ভর্ত্তি বাঘ।

সে কথা শুনে জয়িস বল্‌লে—তোমরা সেখানে বাস কর কি করে ? আচ্ছা তোমাদের দেশে ঘর-বাড়ী আছে ত ?

দেশের সম্বন্ধে এমন অপবাদের কথা শুনে মুখার্জ্জির ভয়ানক রাগ হয়। সে মুখ বিকৃত করে বল্‌লে—না, আমরা বুনো বানর, গাছের ডালে বাস করি।

ঘোষ বল্‌লে—আহা, বেচারী ছেলেমানুষ, বোঝে না, অত রাগ কর কেন ?

আমরা খেতে থাকি। আমার এক কাপ চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে। তাই মিসেস্ ক্লেটন জিজ্ঞাসা করেন—আর এক কাপ দেব কি ?

আমি আপত্তি না জানিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে আর এক কাপ গ্রহণ কর্‌লাম।

ঘোষ মন্তব্য প্রকাশ কর্‌ল—ঠাণ্ডা দেশে এক কাপ কেন, দশ কাপ খেলেও মন্দ লাগ্‌বে না।

তারপর খাওয়া শেষ হ'ল। মিসেস্ ক্লেটন আমার সঙ্গে কত গল্প কর্‌তে সুরু কর্‌লেন! তাঁ'র নিজের কথা বলেন,

স্বামীর ফটো দেখান। তিনি দশ বছর হ'ল মৃত। তাঁ'র সম্বন্ধেও কত কথা বলেন—তিনি যখন ছিলেন, কি সুখের দিনই ছিল। আমি তাঁ'কে সহানুভূতি জানাই।

'ম্যাণ্টল্ পিস্'এর ওপর খুব দামী ষ্ট্যাণ্ডে সাজান একটী যুবকের ফটোর প্রতি দৃষ্টি পড়্ল। মিসেস্ ক্লেটনকে জিজ্ঞাসা কর্লাম—এটা কা'র ফটো ?

তাঁ'র বুকে একটা বড় দীর্ঘনিশ্বাস বয়ে গেল। তিনি বল্লেন—ও আমার ছেলে ছিল, জানঁ মিঃ সেন। কলেজে পড়্ত আমার ছেলে, ক্রিকেট খেল্ত খুব ভাল। এমন সময় জার্ম্মানির সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধ্ল। হুকুম এল আঠারো বছরের ওপর যাদের বয়স সে সব ছেলেদের যুদ্ধে যেতে হবে। আমি ছেলেকে ডোভার ষ্টেশন অবধি এগিয়ে দিয়ে এলাম। চোখে আমার জল দেখে যাবার সময় ছেলে হেসে বল্লে—'ভয় কি, আবার আস্ব।' কিন্তু সে ত আর ফির্ল না!

আমার মনে হল, অজানিত ভাবে তাঁ'র দুঃখের স্থানেই আঘাত ক'রে বসেছি যেন। আমি তাঁ'কে সহানুভূতি জানালাম।

তিনি আবার বল্তে লাগলেন—সে তখন তিন মাস হ'ল যুদ্ধে গিয়েছে; হঠাৎ তা'র চিঠি আসা বন্ধ হয়ে গেল। এর আগে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত তা'র চিঠি পেয়ে এসেছি। তারপর পাশের বাড়ীর গিলবার্টএর চিঠিতে খবর এল যে

সে আর নেই, একটা কামানের গোলা এসে তা'র দেহকে একেবারে গুঁড়ো করে দিয়েছে, কণামাত্রও খুঁজে পাওয়া যায় নি।

মুখার্জ্জি বল্‌লে—আচ্ছা, মানুষের এ রকম পরস্পরকে মেরে কেটে কি সুখটা হয় বল ত ?—কে তার উত্তর দেবে ?

মা বলেন—জয়িস্, তোর তা'কে মনে পড়ে ? সে যখন যায়, তুই তখন তিন বছরের এতটুকুন মেয়ে। তোকে খুব ভালবাস্‌ত সে।

মৃত পুত্রের শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যুর স্মৃতি মায়ের চোখে জলের আকার ধারণ ক'রে নেমে আসে। তিনি তা কিছুতেই রোধ করতে পারেন না।

পোড়া ১৯১৪ সালের যুদ্ধ এমনি নিষ্ঠুর ভাবে ইংলণ্ডের প্রতি ঘরে ঘরে তার স্মরণচিহ্ন রেখে দিয়ে গেছে। সে স্মৃতিতে সুখের লেশমাত্র জড়িত নাই, জড়িত হয়ে আছে অকালে ঝরে যাওয়া কতগুলি তরুণ জীবনের কথা, আর মানুষের বর্ব্বরতার সুনিবিড় কলঙ্কের কথা।

অনেক দেরী হতে চলেছে দেখে আমি মিসেস্ ও মিস্ ক্লেটনের নিকট বিদায় নিয়ে ওপরে উঠে এলেম। যাবার সময় তাঁ'রা বল্‌লেন—আবার এসো।

সেদিন আমার খুবই মনে হয়েছিল—বাহিরে যতই এরা নির্ব্বিকার মানুষের খোলস পরে থাকুক না কেন, ভিতরে

ভিতরে এরাও ঠিক আমাদেরই মত মানুষ। এই যে মহিলাটি, ইনি মৃত স্বামী ও পুত্রকে আমাদের দেশের মেয়েদেরই মত ভালবাসেন। তাদের স্মৃতিতে এঁরও চোখে তাঁ'দেরই মত জল ঝরে। দয়া-মায়া সুখ-দুঃখ বোধ ভগবান জগতের কোন জাতিকেই কম দেন নি।

আট

এখন পোষ মাস পড়ে গিয়েছে, আমরা ভরা শীতের মাঝখানে এসে পড়েছি। গরম দেশের লোক আমরা, পশ্চিমের শীতকে কোনদিন চোখে দেখি নি, কল্পনায় এঁকেই ক্ষান্ত থাক্‌তে হয়েছে। এখন সেই দারুণ শীত যেন আমাদের মুখোমুখি হ'য়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

মনে মনে ভয় থাক্‌লেও অজানিতকে জানবার একটা সুযোগ সাম্‌নে এলে তরুণের মনে পুলক সঞ্চার না করে যায় না। ভয়ের জিনিষ যতক্ষণ দূরে থাকে, ততক্ষণই যেন তার ভয় জাগানর ক্ষমতা থাকে। একেবারে কাছে এসে পড়লে যেন সে ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, সে হীনবল হয়ে পড়ে। শীতকে দূর থেকে তাই যত ভয়ঙ্কর মনে হয়েছিল, কাছে আস্‌তে দেখা গেল সে আসলে তেমন ভয়ঙ্কর

নয়। এখানের শীত, এমনি কি তা অসহ্য! এমনি কি অশান্তির সৃষ্টি করে, সে আমাদের? গায়ে কতকগুলো গরম জামা পরতে হয়, আগুন জ্বালিয়ে তার কাছে ঘেঁসেই একটু বস্‌তে হয়, আর গরম জল ভিন্ন হাত-মুখ ধোয়া যায় না—এই যা; তা না হলে ত আমরা এমন কিছু কষ্টে পড়ি নি। সাধারণ ভারতীয়েরা সত্যি সত্যি এখানের শীত বেশ ভাল ভাবেই সহ্য কর্‌তে পারে। সেই কারণে এখানের লোকেরা আমাদের ঠাট্টা করে বলে থাকে—নতুন গরম দেশ থেকে আস্‌ছ, গায়ে অনেক গরম সঞ্চয় করে এনেছ, তারই জন্যে শীত-বোধটা ভাল রকম মালুম হচ্ছে না।

এখন কুড়ি ডিগ্রী 'ফারেনহীট' উত্তাপ নেমেছে; তার মানে বরফের উত্তাপের নীচে বারো ডিগ্রী চলে গিয়েছে। এখনও বরফ-পড়া সুরু না হলেও বরফের অগ্রদূত 'ফ্রষ্ট' প্রায় রোজ সকালবেলা দেখা যায়। মাটিতে হিম পড়ে, ঠাণ্ডায় সে হিম জমে বরফ হ'য়ে যায়, তাকে বলে ফ্রষ্ট। এর ফলে সমস্ত মাটির বুকে একটা পাত্‌লা জমাট বরফের আস্তরণ পড়ে যায়, তাতে রাস্তাঘাট এত পিছল হয় যে কারও ভূপতিত না হয়ে আর উপায় থাকে না।

সেদিন সকালে 'ব্রেকফাষ্ট' টেবিলে 'মেড্‌' এসে খবর দিয়ে গেল—আজ ভারি ফ্রষ্ট হয়েছে।

ফ্রষ্ট কা'কে বলে ভাল করে জানি না, কখনও দেখি নাই।

তাই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় কর্‌বার ইচ্ছাটা খুব প্রবল হয়ে উঠ্‌ল, কারণ অজানিতের প্রতি আকর্ষণটা স্বভাবতঃই মানুষের বেশী হ'য়ে থাকে। তা ছাড়া আমার সেদিন ভারতবর্ষে পৌঁছবার চিঠি ফেল্‌বার দিন, সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ ডাকটিকিট ছিল না। কাজেই টিকিটের জন্য একবার আমাকে বাহিরে যেতেই হবে। ল্যাণ্ডলেডি অনেক বারণ করা সত্ত্বেও আমি সাহসে ভর ক'রে বেরিয়ে পড়্‌লাম।

দরজা হ'তে বেরিয়ে সদর্পে সবুট পদক্ষেপে চলেছি, 'ফ্রষ্ট'এর মাহাত্ম্য যে পায়ের তলায় সে কথা আগ্রহের আতিশয্যে ভুলে গিয়েছিলাম। এক পা, দু পা, তিন পা—তার বেশী আর চলতে হয় নি, চতুর্থ পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই উন্মূলিত তরুর মত 'পপাত ধরণীতলে'! শুধু তাতেই শেষ নয়, পিছল ফুটপাথের ওপর দিয়ে সেই ধাক্কার জোরেই আরও দশ হাত মুহূর্ত্তের মধ্যে গড়িয়ে গেলাম।

পেছনে একজন ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন, তিনি সহানুভূতি দেখিয়েই বল্‌লেন—লাগ্‌ল নাকি? অমন করে ফুটপাথের ওপর দিয়ে কি যেতে হয়? রাস্তার মাঝখান দিয়ে যাও, ঠিক যেখান দিয়ে গাড়ীর চাকা চলেছে।

আমি চেয়ে দেখি সত্যি, যেখান দিয়ে গাড়ী গেছে, চাকার চাপে বরফের চাঁই ভেঙ্গে গিয়ে সেখানে গুঁড়ো হয়ে

গেছে, সেখানটা আর পিছল নয়। আমি তাঁ'কে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর দেখান পথ দিয়ে অক্লেশে হেঁটে চলি।

খানিক বাদে একটি জনবহুল জায়গায় এসে দেখি, মহা গণ্ডগোল। কারণ কিছুই নয়, একটি ছেলে আছাড় খেয়ে কান্না জুড়েছে, তার মা তাকে কোলে তুলে নিতে এসে নিজেও আছাড় খেয়ে ধরাশায়ী। ঘর থেকে তাই দেখে বাবা এসেছে তাদের তুল্‌তে, কিন্তু 'এক যাত্রায় পৃথক ফল' বিধাতা তার ভাগ্যে লেখেন নি, তাই তারও সেই দুর্দ্দশা। শেষে আর দাঁড়াবার সাহস তাদের হয় নি, হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ফির্‌তে হ'ল।

আরও দূর চলেছি, আছাড় বিশেষ খাই না। কারণ চালাক হয়ে গিয়েছি, পথের মাঝখান দিয়ে গাড়ীর চাকার ওপর দিয়ে চলি। পথে দেখি এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক হঠাৎ এক আছাড় খেলেন, তাঁ'র টুপি গেল এক দিকে, আর ছাতা গেল এক দিকে। আমি তাঁ'র ছাতাটা এনে দিয়ে বিজ্ঞের মত উপদেশ দিলাম রাস্তার মাঝখান দিয়ে চল্‌তে। তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে উপদেশ পালন কর্‌লেন।

এমনি পথে চল্‌তে চল্‌তে সেদিন কম করে একশতটি লোককে চোখের সামনে আছাড় খেতে দেখেছি। এমন আছাড়ের হুড়োহুড়ির মধ্যে যেমন একটু কষ্টবোধ আছে, তেমন তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বিনা পয়সায় অনেকখানি

কৌতুক-রসেরও সৃষ্টি হয়। যেখানে আছাড়টা সামান্যের ওপর দিয়েই যায়, সেখানে লাভের অংশই ষোল আনা।

প্রকৃতির কল্যাণে সেদিন সারা লণ্ডনের বুকের ওপর এমনি আছাড় খাওয়ার ধুম পড়ে গিয়েছিল। হাসির উচ্ছ্বাসও সেদিন না জানি বিনা পয়সায় কত শত লোকের ভাগ্যে জুটেছিল। বিকালের কাগজে দেখা গেল যে সে কৌতুকের উপকরণ জোগাতে দশটি হাজার লোকের গায়ে অল্পবিস্তর জখম হয়েছিল।

'ফ্রষ্ট'-এর সঙ্গে এইরূপ ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের পর আর বেশী দিন বসে থাক্‌তে হয় নি, কয়েক দিনের মধ্যেই তুষার-পাত দর্শন আরও অভাবনীয়রূপে আমাদের ভাগ্যে ঘটেছিল।

সেদিন ছিল অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি। রাতে কখন ঘুমিয়েছি মনে নাই। রাতের শেষে হঠাৎ আমরা জেগে উঠে দেখি, ঘর আলোয় আলোময় হয়ে গিয়েছে। জানালার পর্দ্দার আবরণও সে আলো রোধ কর্‌তে পারে নি। তবে কি ভোর হয়েছে? ঘড়ি বলে—হয় নি, এখনও অনেক দেরী আছে। কিসের আলো দেখ্‌বার জন্য মনে একটা তীব্র কৌতূহল জাগ্‌ল। পা দুটো বিছানা হ'তে যন্ত্রচালিতের মত আমাকে বিছানার ধারে নিয়ে গেল। হাত দিয়ে পর্দ্দা তুলে দেখি, একি মনোরম দৃশ্য!

বাহিরটা আলোয় ভরে গিয়েছে। চারিদিক সাদায় সাদা,

—আকাশ সাদাটে মেঘে ভরে গেছে, মাটি সাদা বরফে ছেয়ে গেছে, গাছের দেহ ও পাতা তুষারের কুঁচিতে ঢেকে গিয়েছে; বাড়ীর ছাদ তুষারে ঢাকা, বাড়ীর আল্‌সে তুষারে ভরা, বাড়ীর জান্‌লার আশেপাশে তুষারের ঝুরি ঝুল্‌ছে। এ যেন এক স্বপ্নপুরী! মুহূর্ত্তের মধ্যে নয়ন আমার বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল, অন্তরে পুলকের ঢেউ বয়ে গেল। সেদিন খুব বেশী করেই ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থের সেই লাইনটা মনে পড়েছিল—
"Earth hath not anything to show more fair."

সেদিন সুন্দরকে যে-রূপে দেখেছি, সে রূপখানি আমার মানসপটে চিরদিনের মত অঙ্কিত হয়ে গেছে। সুন্দরের এমন মনোহর আবির্ভাব কোন দিন ত দেখি নি! বসন্তে নূতন ফোটা ফুল আর মুকুলে পরিশোভিত বনানীর শোভা দেখেছি, তা সুন্দর বটে; বর্ষার আকাশে সজল মেঘের বুকে কাজল-আভা দেখেছি, তাও সুন্দর বটে; বাংলা-মায়ের বুকে 'ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলা' দেখেছি, শরৎকালের রাতের জ্যোৎস্না দেখেছি—এরাও সুন্দর বটে; কিন্তু আজ যে অভিনব মনোমোহকর বেশে সুন্দরের অবির্ভাব আমার তু'-চোখের আগে দেখ্‌ছি, এমনটি ত কোথাও কোন দিন পাই নি, এমন করে আর কোন সৌন্দর্য্যই কোন দিন আমার হৃদয় আলোড়ন করে নি। ওপরে সাদা, নীচে সাদা, গাছ সাদা, বাড়ী সাদা,—বাতাসে সাদা তুষার উড়্‌ছে, মেঘ হতে সাদা তুষার

ঝরছে—এই যে সাদার বিপুল বিস্তার, এর কি কোথাও তুলনা আছে? জগতের পেছনে কোথায় কোন্ চিত্রকর লুকিয়ে আছেন জানি না। তিনি কত বিচিত্র বর্ণের ছবি আঁকেন। আজ যেন খেয়ালবশে তিনি কেবল একটি রঙের ছবি এঁকেছেন, আর সে রঙ্টি সাদা। এ সাদা রঙেরই বা তুলনা কোথায় পাই? এ কি বল্ব দুধের মত সাদা?—তাতে যেন নীল রঙের আভাস আসে। শ্বেতপাথরের মত সাদা?—তাও ঠিক নয়। তবে কি বল্ব, তুলোর মত সাদা, মেঘের মত সাদা, সমুদ্রের ফেনার মত সাদা?—কোনটিতেই মন সায় দেয় না। এ ঠিক তুষারেরই মত সাদা।

এ যেন রূপকথার পরীর রাজ্য! তুষার পড়ে পড়ে সব ঢেকে গিয়েছে। গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায় আজ সাদার আবরণ, ঘরের আশে পাশে সাদার প্রলেপ, বাহিরে মাঠে ঘাটে আজ সাদা বরফের গালিচা পাতা। সারা জগৎ জুড়ে যেন আছে একখানি মাত্র রঙ্, আর কোন রঙ্ নেই।

এমনি ভাবে তুষারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

তুষার দেখ্তে যেমন মনোরম, স্পর্শ করতেও তেমন নরম। তুলোর মত দেখ্তে যেমন সাদা, স্পর্শ করতেও তেমন তুলোর মতই নরম, টিপ্লে বালির মত সরে সরে যায়। তার ওপর যখন পা ফেলি, পিছ্লে পা সরে যায় না, ধীরে ধীরে তার মধ্যে বসে যায়; অনুভবেও তা কেমন শীতল!

তুষারপাত দেখ্‌তে যে ঠিক কেমন জিনিষ আমরা, গরম দেশের লোকেরা, ঠিক তা অনুমান করে নিতে পারি না। আমাদের দেশে ফাল্গুনের শেষে শিমূল ফল ফেটে যখন তুলো উড়ে গাছের তলায় ছড়িয়ে পড়্‌তে থাকে, তা অনেকে লক্ষ্য করে থাক্‌বেন বোধ হয়। তুষারপাতের সঙ্গে ঠিক তুলনা না হলেও তা হতে খানিকটা তার আভাস মেলে। তবে এইটাকে আরও বড় আকারে কল্পনা করে নিতে হবে। যখন তুষারপাত হ'তে থাকে সারা আকাশ ভরে দেখা যায় কেবল তুষার-কণা দ্রুতবেগে মাটির দিকে নেমে আস্‌ছে। আশেপাশে ওপরে নীচে যেদিকে চাই, সেদিকেই দেখি কেবল তুষার-কণা, রাশি রাশি ছড়িয়ে পড়্‌ছে। বাহিরে যদি তখন আসি, দু-চার মিনিটের মধ্যেই দেখা যাবে সমস্ত পোষাকের ওপর একটা তুষারের সাদা প্রলেপ বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমন ভাবে পড়্‌তে থাকে, মাটির ওপর এক ফুট, দু ফুট, তিন ফুট জমে যায়। নীচু জমিতে সেই তুষার জমে অনেক জায়গায় সাত-আট ফুট পর্য্যন্ত গভীর হয়। সেই তুষারে মানুষ পড়্‌লে ডুবে মারা যাবারই সম্ভাবনা।

এমনি নানাভাবে তুষার আমাদের চিত্ত আকর্ষণ ও নয়ন রঞ্জন করে; তার কারণ, তুষারপাত আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ। কিন্তু আরও বড় কারণ হল, তুষারপাত জগতের একটি অনুপম দৃশ্য।

নয়

অনেক কাল পরে আজ আকাশের মুখ দেখ্‌লাম। আকাশ ঠিক নীল না হ'লেও তা আজ মেঘমুক্ত ত বটে! শীতের কল্যাণে সূর্য্য অনেকখানি মলিন ও নিষ্প্রভ হলেও তাকে আজ ত চোখে দেখা গেল! এমন দিন যে কত কাল পরে ফিরে এল, হিসেব করে তার ঠিক পাওয়া যায় না।

এই সূর্য্যের আলোর প্রসাদবিহীন দেশে এমন উজ্জ্বল একটি দিনের দাম যে কত বেশী তা আমরা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ব না। এ দেশে মেঘ, কুয়াসা, বৃষ্টি, অন্ধকার—এইগুলি হ'ল সহজ স্বাভাবিক অবস্থা; আর নীল আকাশ, সূর্য্যের আলো, চাঁদের কিরণ এইগুলিই হ'ল ব্যতিক্রম। তার জন্য যেদিন সারা দেশটাকে আলোয় উদ্ভাসিত করে সূর্য্যদেব দেখা দেন, সে দিনটার মত সুন্দর সু-দুর্লভ দিনের দাম এঁদের কাছে

অনেক বেশী। সে দিন লোকের মনে আনন্দের অবধি থাকে না, সকলেই হাসিভরা মুখ নিয়ে সকলকে বলে—Is n't it a lovely day ? এমন দিনকে 'স্বাগত' কর্‌বার জন্য তারা দলে দলে মাঠে বেরিয়ে পড়ে, সারাদিন বাহিরে কাটিয়ে দেয়, ঘরে আর কেউ থাকে না।

কিন্তু এ আনন্দের সঙ্গে আমার মন যেন যোগ দিতে চায় না; তা আজ কেমন যেন বেসুরা বাজে। আজকের দিনের এই দেশের মত পরিষ্কার আকাশ ও আলোয় ভরা দিন যেন দেশের কথা বেশী করেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

মনে পড়ে যায় আমার দেশের আকাশ আরও কত নীল, আমার দেশের সূর্য্যের মুখ আরও কত উজ্জ্বল। সেই সঙ্গে মনে পড়ে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের কথা। সারা দিনে কত গল্প, কত হাসি, কত স্নেহ, কত আদর! এখানে ত তার কিছুই মেলে না। বুভুক্ষিত মনটা তাদের পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কোথায় আমার স্বদেশ, কোথায় আমার আত্মীয়েরা? তাদের জন্য মন বড় কেমন করে আজ!

এ দেশে চারিদিকেই অনাত্মীয়। কেউ স্নেহভরে চায় না, কেউ ডেকে কথাটী কয় না। চারিদিকে এত মানুষের ছড়াছড়ি, তবু যেন মরুভূমির মাঝখানেই বাস কর্‌ছি;—আমাকে দেখ্‌বার কেউ নাই, আমার জন্য ভাব্‌বার কেউ নাই। সকালে যদি চায়ের টেবিলে না গিয়ে উপবাস করি

ত কারও এখানে কিছু এসে যায় না। রাতে যদি বাড়ীতেই না ফিরি, কারও ভাবনা হ'বে না—কি হ'ল আমার।

সকল আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে এত দূর দেশে যখন কেউ আসে, তার সব থেকে অভাববোধ জাগায় এই স্নেহেরই অভাব। আত্মীয়-স্বজন হ'তে বিচ্ছেদের দুঃখ ত আছেই, কিন্তু তার থেকে বড় দুঃখ হ'ল দৈনন্দিন ছোট-খাটো ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে তাদের কাছ হ'তে যে স্নেহধারার আস্বাদ পাই, তার একান্ত অভাব অনুভব। সে স্নেহধারার উৎস ত আমরা হারিয়ে ফেলি, তার পরিবর্ত্তে এক কণামাত্র স্নেহও বড় একটা কারও কাছ হ'তে পাই না।

দুপুরে যখন রেস্তরাঁয় গিয়ে খাবার খাওয়া সার্‌তে হয়, আমার সেটা মস্ত বড় দুরূহ সমস্যার মত ঠেকে। খাবার চেয়ে খেতে কোন দিন অভ্যস্ত নই, খেতেও হয় নি। ক্ষুধা-বোধ জাগ্‌বার আগেই বরাবর দেখে এসেছি—মা খাবার নিয়ে উপস্থিত। কোন দিন চেয়ে খাবার সুযোগ পর্য্যন্ত জোটে নি। এমনি অপর্য্যাপ্ত স্নেহ পেয়ে যে মানুষ, তার খাবার চেয়ে খেতে বড় বাধ বাধ ঠেক্‌ত, অন্ততঃ প্রথম প্রথম ত খুবই। সেই কারণে, স্বীকার কর্‌তে লজ্জা নেই, কত দিন দুপুরে না খেয়েই কাটিয়ে দিয়েছি।

রেস্তরাঁয় খাওয়াতে অনেক দিক হ'তে আবার অনেক সুবিধাও সত্যই আছে। পরিবেশন সেখানে অতি শৃঙ্খলার সঙ্গে

সম্পন্ন হয়, খাদ্য মেলে বহু প্রকারের। কিন্তু তার সকল গুণ সত্ত্বেও, একটা মস্ত বড় দোষ তার রয়ে যায় এই যে, যে সেবা পাওয়া যায় তা স্নেহমণ্ডিত নয়, তা নিছক পয়সা দিয়ে কেনা। যে সেবার প্রেরণা স্নেহ এবং যে সেবার প্রেরণা অর্থ-উপার্জ্জন—তাদের মাঝখানে একটা মস্ত বড় তফাৎ যে রয়ে গিয়েছে তা স্বীকার কর্‌তেই হবে। পয়সা দিয়ে কেনা সেবার বাহিরে যতই জৌলস থাকুক, সেটা হৃদয়-বৃত্তি-বিবর্জ্জিত এবং সেই কারণেই অন্তঃসারশূন্য। রেস্তরাঁয় এই যে পরি-চারিকাদের সেবা, তার মধ্যে সেই হৃদয়বৃত্তির স্পর্শ কই? তারই অভাব আমার মনে কষ্ট দেয়।

রেস্তরাঁয় যে সব 'ওয়েটার' থাকে, তাদের বদলে যদি কয়েকটি যন্ত্রচালিত পুতুল রাখা যেত, যারা পরিবেশন করতে সক্ষম, তা হ'লেও বোধ হয় নতুন কিছু অভাববোধ কারও মনে জাগ্‌ত না। এমনি নির্ব্বিকার প্রাণহীন তাদের ব্যবহার,—ঠিক যন্ত্রচালিতের মত। আমি ঠিক যে ক'টা খাদ্যের হুকুম দেব সেই ক'টাই এসে হাজির হবে, কেউ বল্‌বে না—এই রান্নাটা ভাল হয়েছে, একটু খেয়ে দেখ না। যদি কিছু না খাই, কেউ বল্‌বে না—কিছু খেলে না কেন? হাত গুটিয়ে বসে থাক, প্লেট টেবিল হ'তে উঠে যাবে—খানিক বাদে বিল্ এসে হাজির হ'বে। এরা ত মানুষ নয়, এরা যন্ত্র!

রেস্তরাঁয় বসে এ সব দেখে আর কি করেই বা খেতে রুচি

হয়! মন তখন ক্ষোভে বলে—খাব না। এমনি চেয়ারে বসে বসে ভাবতে থাকি দেশের কথা, যেখানে খাবার না চেয়ে পাওয়া যেত এবং না খেলে পরে আমার থেকে মায়েরই মাথা-ব্যথা হ'ত বেশী। অতৃপ্তিভরে মন সেই পুরাতন স্মৃতির কথাই ভাব্‌তে থাকে, খাবার প্লেটে যেমন পড়েছিল, পড়ে থাকে। খানিক বাদে উঠে চলে আসি।

মনটা খারাপ হয়ে যায়। কোথায় যাব, কি করে সময় কাটাব—সেইটা হয়ে ওঠে মস্ত বড় সমস্যা। আপন মনে চল্‌তে চল্‌তে খেয়ালবশে মাঠে গিয়ে হাজির হই, গাছতলায় বসি। দুপুরবেলা সকলে যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত, তাই মাঠ প্রায় খালি। কেবল শোনা যায় দূরে দূরে ছোট ছেলে-মেয়েরা খেলতে খেলতে কোলাহল কর্‌ছে।

পাখীরা গাছে খেলা করে, বাতাস বয়; আমি একা একা বসে থাকি মাঠের ওপর, সবুজ ঘাসের ওপর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ভাবে কেটে যায়। বই পড়তে চেষ্টা করি, ইচ্ছা করে না, চুপ করে বসে অমনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাই। জনহীন প্রান্তর আবার সন্ধ্যার দিকে জন-সমাগমে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই রকম করে এক-একটা দিনকে জোর করে কোন রকমে কাটিয়ে দিয়ে তারপর ঘরে ফিরি।

মনটা হাঁপিয়ে ওঠে, আর ভাল লাগে না; ইচ্ছে করে দেশে পালিয়ে যাই। সে ত সম্ভব নয়, মনে মনে দিন গণি

—আরও কত কাল আছে বাড়ী ফের্‌বার সময় আস্‌তে। গণ্‌তে গিয়ে থই পাই না—এখনও কত শত দিন এমনি একটি একটি করে কাট্‌বে, তবে দেশে ফের্‌বার দিন আস্‌বে। এখনও অকূল-সাগরে পড়ে আছি, ডাঙ্গার দিশা মিল্‌তে এখন কত দেরী! ভাব্‌তে মন আরও ভেঙ্গে যায়। উপায় কি? সান্ত্বনা নেই, বিবশ মনে ফিরি।

দশ

'রাঙাদি' বিশেষ অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছেন যে তাঁ'র বাড়ী আজ ছুটির দিনে যেতে হবে; তাই ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে চলেছি। তাঁ'র বাড়ী উইণ্ড্‌সর্‌এর দিকে, লণ্ডন হ'তে কুড়ি মাইল দূরে, পথে রেডিংএ সাটনের বাগান এবং আরও একটু দূরে 'হিজ্‌ মাষ্টারস্‌ ভয়েস্‌' গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরীও চোখে পড়ে।

গাড়ীতে লণ্ডন ছেড়ে দু-পাঁচ মাইল বেরিয়ে পড়লেই একটা যে স্পষ্টতর আলোর রাজ্যের মাঝে এসে পড়ি তা বেশ অনুভব করা যায়। যে আলো লণ্ডনের ধোঁয়াটে আকাশ ভেদ করে মলিন ও হীনপ্রভ হয়ে দেখা দেয়, সে আলো এখানে উজ্জ্বলতর হয়ে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

শীতের শেষে এখন বসন্ত এসেছে। তাই মাঠের ঘাস

এখন ঘন সবুজ বেশ ধারণ করেছে। গাছগুলো আর শুক্‌নো কাঠের মত রুক্ষ মূর্ত্তি হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, সবুজ পাতায় আর ফুলে ভরে গিয়েছে। চারি পাশে পাখী উড়্‌ছে, পাখী ডাক্‌ছে। কোথাও বা মাঠের পর মাঠ জুড়ে 'বাটার কাপ্‌' ও 'কাউ স্লিপ' ফুল ফুটে রয়েছে ;—হল্‌দে রঙের ছোট ছোট ফুল, কিন্তু সংখ্যায় এত প্রচুর ফোটে যে সারা মাঠ হল্‌দে রঙে ছেয়ে যায়, এতটুকু ফাঁক মেলে না যেখানে সবুজ ঘাসের রঙ্‌ চোখে পড়বে। দেশে সর্‌ষে ক্ষেতে যখন সর্‌ষে ফুল ফোটে, তার সঙ্গে এর অনেকটা তুলনা হয়। কিন্তু সর্‌ষে গাছ লম্বা, এ ছোট—মাটির সঙ্গে একেবারে লেগেই থাকে। পথের দুই ধারে আরও কত কি রঙ্‌-বেরঙের ফুল ফোটে, তাদের নামও জানি না। চারিদিকে যেন একটা জাগরণের সারা পড়ে গেছে, বয়ে চলেছে একটা আনন্দের ঢেউ ; চারিপাশে রূপ, রঙ্‌, গন্ধ, গানের মেলা।

শীতের পরেই বসন্ত আসে বলে বসন্তের সৌন্দর্য্য ফোটে বেশী, কালোর পাশেই সাদার শোভা মানায় ভাল। কিন্তু এই যে পার্থক্যহেতু উৎকর্ষবোধ, এটা এদেশে ক প্রখর, কত গভীর, তা আমাদের দেশের শীত ও বসন্তের তুলনা হ'তে ধারণা কর্‌তে পার্‌ব না।

দেশের শীতে প্রকৃতি ত একেবারে মরে না, কেবল ঝিমিয়ে পড়ে মাত্র ; সকল গাছের পাতা একেবারে ঝরে

না, আকাশে মেঘ নামে না, সূর্য্যের মুখ প্রায় রোজই দেখা যায়। তাই বসন্তে সেখানে যখন গাছে নতুন পাতা ধরে, পাখী ডাকে এবং ফুল ফোটে, তাদের পার্থক্যটা তত প্রখরভাবে পরিস্ফুট হয় না,—যেন ঝিমিয়ে পড়া থেকে নূতন করে জাগা।

কিন্তু এ দেশের শীতে প্রকৃতি মাত্র ঝিমিয়েই পড়ে না, একেবারেই মরে যায়। গাছে পাতা একটিও থাকে না, আকাশে ঘনঘটা করে মেঘ নেমে আসে, ঘন তুষারে ঢেকে যায়, কোথাও আর প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। এই একেবারে মরণ থেকে বসন্তের প্রথমে প্রকৃতি যেন কা'র জীবন-কাঠির স্পর্শ পেয়ে নূতন করে বেঁচে ওঠে; শুধু বেঁচে ওঠে না, একেবারে পরিপূর্ণ শোভামণ্ডিত হ'য়েই দেখা দেয়। সে এমনি হঠাৎ যে সকলের চমক লাগিয়ে দেয়। কাল দেখা গিয়েছিল মাঠে ঘাস নেই, গাছে পাতা নেই, পাখীর ডাক নেই, আর আজ দেখি মাঠ ঘাসে ফুলে ছেয়ে গিয়েছে, গাছে পাতার বাহারের অন্ত নেই, চারিদিক পাখীর ডাকে মুখরিত। তারা যেন মাটির তলায় গাছের ভেতরে বসেছিল, কা'র আহ্বান-বাণী শুনে একটি দিনের মধ্যে সব বেরিয়ে এল! এখানে শীত যেমন প্রখর, বসন্ত তেমনি মধুময়, শীতে প্রকৃতির যেমন কিছুই থাকে না, বসন্তে তেমনি প্রচুর সে পায়। দুয়ের মধ্যে পার্থক্য এত গভীর বলেই বসন্তের শোভা এত মধুর।

লণ্ডন হ'তে এমন বসন্তের দিনে লণ্ডনের বাহিরে আসা, শীতের পরে বসন্তের আগমনেরই মত মধুময়; আঁধার হ'তে আলোর রাজ্যে প্রবেশের মতই সুখকর এবং দুঃখের পর সুখের অনুভূতির মতই স্বস্তিজনক। এতদিন কীটের মত বাস করেছি—বাড়ীর খোপে আর আঁধার-ভরা আকাশের তলায়; আলো কা'কে বলে জানি নি, নির্ম্মল বাতাসের আশীর্ব্বাদ মাথায় পাই নি। আজ এলাম খোলা মাঠের মধ্যে, নীল আকাশের তলে—যেখানে প্রকৃতি পরিপূর্ণ শোভার ভাণ্ডার সাজিয়ে বসে রয়েছে।

'ওয়েষ্ট ড্রেটন্' ষ্টেশনে গাড়ী এসে থাম্‌ল। 'রাঙাদি' প্লাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে, তাঁ'র বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্যে।

চারিদিকে ফাঁকা মাঠের মধ্যে সুন্দর বাগানে ঘেরা বাড়ী, গ্রাম্য জীবনের সম্পূর্ণ স্বাদ মেলে সেখান হ'তে। বাগানে 'আপেল' আর 'পিয়ার' গাছে ফুল ধরেছে, ফুলে সুন্দর গন্ধ। আরও কত কি ফুল! 'উইলো' গাছের তলায় আমাদের বস্‌বার জায়গা হয়েছে, 'রাঙাদি'র ইচ্ছা আজ আমরা গাছের তলায় বসে 'লাঞ্চ' খাব।

ডাক্তার লিয়ন্‌এর সঙ্গে পরিচয় হ'ল। তিনি এক ইংরাজ ডাক্তার, আমারই মত আজ এঁদের অতিথি।

আমি এসেছি বলে আজ ভাত ডাল পাঁপর ইত্যাদিও রান্না হয়েছে। ডাক্তার লিয়ন্‌কে তা 'চাক্‌তে' দেওয়া হয়েছে।

একে বিদেশী জিনিষ, তায় অপটু হস্তের রান্না, তাঁ'র তা ভাল লাগ্‌বে কেন? কিন্তু আশ্চর্য্য এই—পাঁপর ভাজাটা তাঁ'র ভারি ভাল লেগে গেল। তিনি আদর করে তাকে 'সার্ভিয়েট্' ভাজা নামকরণ কর্‌লেন এবং পরে যে তার কথা ভুল্‌তে পারেন নি, তার প্রমাণ—তিনি চিঠিতে আরও 'সার্ভিয়েট' ভাজা পাঠানোর জন্য আমায় অনুরোধ করেছিলেন।

আমার পাতে মাংসের 'কোর্স'টা পড়ে নি, সেটা তাঁ'র নজরে পড়ে গেল। তিনি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—তুমি মাংস নিলে না?

আমি তাঁ'কে জানিয়ে দিলাম যে আমি নিরামিষাশী, ছোটবেলা হ'তেই মাছ-মাংস খাই না।

আমার উত্তর শুনে তাঁ'র কৌতূহল আরও বাড়্‌ল; জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—কেন?

সে অনেক কথা। অতি ছোটবেলায় আমি মাছ খেতেও ভালবাসতাম যেমন, ধর্‌তেও ভালবাসতাম তেমনি। কখন কোনদিন খেয়াল হয় নি, যে এদেরও প্রাণ আছে বা এদেরও কষ্ট হয়। তারপর রাজকুমার সিদ্ধার্থের গল্পে অহিংসাবাদের কথা প্রথম পড়ে মনে চেতনা জাগ্‌ল যে পশু পাখী মাছ এদেরও ত প্রাণ আছে; আমাদের মার্‌লে যেমন কষ্ট হয়, এদেরও ত তেমন কষ্ট হয়! সেই দিন হ'তেই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম মাছ-মাংস খাব না, জীবজন্তু-

বধের হেতু হ'ব না। তারপর এ নিয়ে কত লোকে কত বাধা দিয়েছে, কত তর্ক করেছে, আমার সে প্রতিজ্ঞা টলে নি; যত দিন গিয়েছে ততবল সঞ্চয় করেছি।

আমি এ বিষয় নিয়ে যত ভেবেছি, ততই এ ধারণা আমার দৃঢ় হয়েছে, যে নিরামিষ ভোজন এবং জীবহত্যা হ'তে বিরতি মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশে সাহায্য করে।

জীবহত্যা কেন কর্‌বে, তার সপক্ষে কত লোক কত যুক্তিই দেখিয়েছেন। কেউ বলেন, মানুষ আমিষ খাবার জন্য তৈরী, প্রকৃতি তাকে এমন ভাবেই গঠিত করেছে। তার বড় প্রমাণ হ'ল তার চারটি 'শ্বাদন্ত' আছে। কিন্তু প্রকৃতির যদি তাই উদ্দেশ্য হয়, তাকে কি মেনে নিতে আমরা বাধ্য? মানুষের ধর্ম্ম ত প্রকৃতিকে মেনে চলা নয়, তার ওপর প্রভাব বিস্তার করা। প্রকৃতি তাকে যে পথে চল্‌তে ইঙ্গিত কর্‌বে, মানুষ ঠিক সে পথে যাবে না, সে যাবে সেই পথে যে পথে তার অন্তর তাকে নিয়ে যাবে। মানুষকে প্রকৃতি পাখা দেয় নি বলে যে আমাদের আকাশে ওড়া উচিত নয়— এমন যুক্তি হয়ত কেউ দেখাবেন না। এমন যুক্তি মেনে চল্‌তে হলে এক হিসেবে মানুষের কোন সভ্যতাই প্রকৃতির অনুমোদিত নয়—বল্‌তে পারা যায়।

যাঁ'রা বলেন যে প্রকৃতির নিয়মই হ'ল অজস্র সৃষ্টি এবং অজস্র প্রাণীর বিনাশ পাশাপাশি চল্‌বে, অতএব জীবহত্যায়

প্রকৃতির অনুমোদন আছে, তাদের যুক্তির পেছনে যে বিশেষ জোর নেই, তা এমনিই বোঝা যায়। চারিদিকে অনেক চুরি হয় বলেই যে চুরি করাটা অন্যায় হবে না, এ কথা কোন আইনই স্বীকার কর্‌বে না।

যাঁ'রা বল্‌বেন যে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে এবং সেই কারণে যাঁ'রা নিরামিষ খা'ন তাঁ'রাও প্রাণীবধ-দোষে দোষী, কাজেই নিরামিষ আমিষে কোন পার্থক্য নেই,—তাঁ'দের আমার একটা কথা বল্‌বার আছে। উদ্ভিদও প্রাণবান্‌, জীবজন্তুও প্রাণবান্‌—সে কথা ঠিক। কিন্তু এই দুয়ের মধ্যেও প্রাণবত্তার পরিমাণ হিসাবে পার্থক্য করা যায়। মানুষ যে সাধারণ জীব-জন্তু হ'তে উঁচু স্তরের জীব তা সকলেই মান্‌বেন; কারণ মানুষের মধ্যে প্রাণের প্রকাশ আরও বিস্তৃতভাবে হয়। ঠিক সেই ভাবেই উদ্ভিদের যে জীবন, তা হতে সাধারণ জীবজন্তুর জীবন উঁচু স্তরের। উদ্ভিদেরও হয়ত স্নায়ু প্রভৃতি থাক্‌তে পারে, কিন্তু তাদের অবলম্বন করে যে প্রাণশক্তির প্রকাশ তা জীবজন্তুর প্রাণশক্তি হ'তে নিকৃষ্ট স্তরের। এই পার্থক্যটা যদি আমরা মেনে নিতে পারি, তা হ'লে ক্ষুধা নিবৃত্তিটা আমরা নিকৃষ্টতর প্রাণী দিয়েই সার্‌তে চেষ্টা কর্‌ব। বাঁচ্‌তে গেলে অন্যায় যখন কর্‌তেই হবে, তখন তুলনায় যেটা কম অন্যায় সেটাই ত আমাদের করা উচিত! নিরামিষ খেলেই যে সব ক্ষেত্রেই প্রাণিবধ কর্‌তে হবে এমনও ত নয়!

পাকা ফল খেয়েও আমরা নির্ব্বিবাদে বীজগুলিকে ভাল রাখতে পারি।

নিরামিষ ভোজনের বিরুদ্ধে আর একটা বড় যুক্তি হ'ল—তাতে শরীর খারাপ হয়, স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। খাদ্যের যে অংশকে 'প্রোটিড্' বলে, তা মাংসতে যত বেশী পরিমাণে এবং যত সহজে পাওয়া যায়, নিরামিষ খাদ্যে তা পাওয়া যায় না। কিন্তু নিরামিষ খাদ্যে যে তা একেবারেই পাওয়া যায় না এমনও ত নয়। ডালের মধ্যে, বাদামের মধ্যে, গমের মধ্যে তা প্রচুর পরিমাণে আছে। সুতরাং নিরামিষ খেয়েও 'প্রোটিড্' অংশ যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করা যেতে পারে। উত্তর-ভারতে ত বেশীর ভাগ মানুষই নিরামিষাশী, তাদের স্বাস্থ্য ত তাই বলে কিছু খারাপ নয়। জাতীয় উন্নতির পক্ষেও যে নিরামিষ আহার ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, তার কোন প্রমাণ নেই। ভারতের যে যুগে ভগবান বুদ্ধের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে সকল লোক জীবহত্যা একেবারে পরিত্যাগ করেছিল, সেই অশোকের যুগেই ভারত জ্ঞানে বুদ্ধিতে সভ্যতায় জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল। আর ব্যক্তিগত জীবনে যে নিরামিষ-ভোজন স্বাস্থ্য হানি করে নি, তার প্রমাণ দরকার হ'লে একটা কেন, একশ'টা মেলে।

যদিই বা শরীর একটু খারাপ হয়, আমি তর্কের খাতিরে বল্‌ব—তাতেই বা ক্ষতি কি? শরীরটাই যে সব থেকে বড়

জিনিষ এবং শরীর রক্ষাই যে সব থেকে বড় ধর্ম্ম—এমন কথা অন্ততঃ মানুষের কাছে কখনই সত্য নয়। মানুষ বিজ্ঞানের অনুশীলনে দেহপাত কর্ছে, হিমালয় জয় কর্তে গিয়ে প্রাণ বলি দিচ্ছে, নিছক খেলার খাতিরে কত সহস্র মর্ছে! সন্ন্যাসী,—সে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি কর্বার জন্য শরীরকে শুকিয়ে মার্ছে। শরীরকে তাচ্ছিল্য করা, শরীরকে তুচ্ছ বোধ করা, এ ত মানুষ প্রতিনিয়তই করে। এক্ষেত্রে হৃদয়বৃত্তির তৃপ্তির জন্য নিরামিষ খেয়ে যদিই বা শরীর একটু খারাপ হয়, তাতে এমনি কি ক্ষতি, বা এমনি কি তা মানব-ধর্ম্ম বিরোধী! এই সামান্য আত্মত্যাগের ফলে যতখানি মানসিক তৃপ্তি আমাদের লাভ হয়ে গেল, সেটাও কি একটা সামান্য লাভ?

এত কথা ডাক্তার লিয়নকে কি বোঝাব? তাঁকে বলি—এমনি খাই না।

তিনি তবু ছাড়েন না,—বলেন—কি কারণে খাও না বল্তেই হবে। ধর্ম্মে বারণ নয় ত?

আমি বল্লাম—ধর্ম্মের কোন বাধাই নেই, sentimentএর খাতিরে খাই না।

তিনি আরও চেপে ধরেন, ছাড়েন না। শেষে আমার বল্তে হয়—আমি কোন প্রাণিবধের ভাগী হতে চাই না, এই কারণেই খাই না। এই নিয়ে তর্ক বাধে, নানা কথা ওঠে;

এ বিষয়ে আমার যা বল্‌বার আছে, সবই একে একে বলি, কিন্তু তাঁ'কে বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারি না।

তিনি বলেন—এই হৃদয়বৃত্তি জিনিষটা আমি বুঝ্‌তে পারি না। আমি বলি না, যে জীবজন্তুর ওপর তুমি অত্যাচার কর। কিন্তু ধর, এমন ভাবে যদি তাদের মারা যায় যে তারা কিছুই জান্‌তে পার্‌বে না এবং মৃত্যুর সময় তাদের কোন যন্ত্রণা হ'বে না, তবু কি তোমার আমিষ আহারে আপত্তি আছে?

আমি বল্‌লাম—ষোল আনা আপত্তি আছে; কারণ তার দিক থেকে কোন বাধা নেই ধরে নিলেও, আমি যখন জান্‌ব যে আমার কারণে এই জীবহত্যাটি হ'ল, আমার মনে ত শান্তি হওয়া উচিত হবে না।

আমি যা বোঝাতে চাই, তাঁ'র মনে স্পষ্ট করে তা ফোটে না। আমি তাই বলি—ধরুন, আপনার কোন আত্মীয়, কিম্বা আপনার পোষা কুকুরটিকে কেউ যদি এমন উপায়ে মেরে ফেল্‌তে চায়, যাতে তারা কিছু জান্‌বার আগেই এতটুকু কষ্ট না পেয়েও মরে যায়, তা হ'লেও ধরে নিতে পারি আপনার নিশ্চয়ই কষ্ট হবে। আপনার এই কুকুর বা আত্মীয়টি আপনার বুকে যে স্থান পেয়েছে, অন্যান্য সাধারণ জীবজন্তুও যদি তা পেত, তা হ'লে তাদের মরণের হেতু হ'তে আপনার কি আরও বেশী কষ্ট বোধ হত না?

তিনি হেসে বল্‌লেন—আমার কিন্তু মনে হয়, এটা বেশী-রকম বাড়াবাড়ি। হৃদয়বৃত্তির এমন অনর্থক অপব্যবহার কর্‌তে আমি রাজি নই।

বাস্তবিকই তাঁ'কে কেন, এ দেশের যে-কোন লোককেই আমার এ কথা বোঝান বিশেষ শক্ত। আমার কাছে জীবে দয়া জিনিষটি অতি সুন্দর ও মহান্‌, এদের চোখে সেটি একান্ত অনর্থক, বরং একটা অর্থহীন কুসংস্কার বলেই মনে হবে। এরা যে জীবে দয়া কর্‌তে জানে না, তা নয়; কিন্তু সে অন্য ধরণের। কোন জীবকে আঘাত করা, কিম্বা তার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা—এ সব এরা সহ্য কর্‌বে না, বরং প্রতিবাদই কর্‌বে; কিন্তু নিজের রসনার তৃপ্তি, কিম্বা পোষাকের বাহারের জন্য জীবের প্রাণ নিতে এরা এতটুকু দ্বিধা বোধ কর্‌বে না। প্রাণিহত্যাটা যে অন্যায়—এ বোধ এদের একেবারেই নেই। বাংলা দেশেই এক সময় কয়েক জন ইংরেজের প্রতিবেশী হয়ে আমার দিনকতক বাস কর্‌তে হয়েছিল। তা'দের একটা মস্ত বড় খেলা ছিল, অবসর সময়ে আশেপাশের রাস্তার কুকুরদের গুলি করে মারা। কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলেছিল—রাত্রে তারা ঘুমের ব্যাঘাত করে। এমনি তুচ্ছ কারণে, এমন হেলায় এরা প্রাণ যে নিতে পারে, তার কারণ—এই ব্যাপারটার মধ্যে তারা অন্যায়ই কিছু দেখে না।

আমাদের দেশে, বিশেষ করে বাংলায়, মাছ-মাংস ত বেশীর ভাগ লোকেই খায়। সেখানে যদি কেউ শোনে—অমুক লোকটা নিরামিষাশী, তা'র উদ্দেশে তা'রা মাথা নীচু করে,—ইঙ্গিত এই যে আমরা ওরকম না কর্‌লেও, যে এরকম করে তা'র আচরণ আমরা অনুমোদন করি এবং শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এ দেশে যে নিরামিষ খায় এই বলে, যে আমি প্রাণিহত্যার ভাগী হতে চাই না,—তা'কে সকলে কৌতূহলের চোখেই দেখে, বড় স্থান কেউ দেয় না।

'রাঙাদি' বল্‌লেন—কিরণ, ও কথায় আর কাজ নেই, অন্য কথা বল। আচ্ছা বল ত, তোমাদের দেশে এখন সব থেকে অভাব কোন্‌টার?

আমি বল্‌লাম—আমাদের দেশে অভাব এত রকমের যে তার ফর্দ্দ কর্‌তে গেলে শেষ করা যাবে না, এবং তাদের প্রত্যেকটাই এত দরকারী যে কোন্‌টা বেশী আবশ্যক সে কথা বলা বড় শক্ত হ'বে।

ডাক্তার লিয়ন বল্‌লেন—আমি তোমাদের দেশে গিয়েছি। আমার কি মনে হয়েছে জান? আমার মনে হয়েছে—তোমাদের দেশে সব থেকে বড় সমস্যা হ'ল, দেশের লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি করা। এমন হীনস্বাস্থ্য লোক আমি অন্য কোন দেশে দেখি নি।

আমি বল্‌লাম—আপনি ডাক্তার কিনা, আপনার নজরে

তাই ওই দিক্‌টাই বেশী করে পড়েছে; কিন্তু যে সব দিক জানে, সে আমার কথায় নিশ্চয় মত দেবে।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গেছে। 'রাঙাদি' সকলকে 'রোষ্ট' মাংস এগিয়ে দিলেন এবং আমি তা খাব না বলে আমাকে শেষ 'কোর্স' ফলের 'কাষ্টার্ড' দিলেন।

ডাক্তার লিয়ন্ আর থাক্‌তে পার্‌লেন না, বল্‌লেন—দেখ, আজকে তোমার এই কুসংস্কারটার মাথা খেয়ে বস, আজ তোমার নূতন দীক্ষা হ'ক, এই মাংসের 'রোষ্ট' দিয়ে।

আমি বল্‌লাম—আপনাদের দেশেও আজকাল নূতন মত হয়েছে যে মরণের পরেও জীবন আছে, আর আমাদের দেশে ত সকলেই একবাক্যে পরলোক স্বীকার করে। সুতরাং ও খানাটা পরজন্মের জন্যই রেখে দিই না। এক জীবনেই সব রকমের খাওয়া কি শেষ করে দেওয়া ভাল?

ডাক্তার লিয়ন বল্‌লেন—আমি পরলোকে বিশ্বাস করি না।

আমি বল্‌লাম—জোর করে বল্‌তেও ত পারেন না যে একবারে নেই।

'রাঙাদি' বল্‌লেন—তোমরা খালি তর্কই করবে! এস, তোমাকে আমার বাগান দেখিয়ে আনি;—এই বলে তাঁ'র বাগানে নিয়ে গেলেন।

ছোট্ট বাগান,—তাতে কপি, বীট, মূলো, লেটিয়ুস ইত্যাদি

সব্জি হয়েছে। পাশে অনেক ফুলগাছও আছে। সব তাঁ'র নিজের হাতে তৈরী।

কেবল তাঁ'র বাগান দেখিয়েই তৃপ্তি হয় না, সহরের বাহিরে মাঠ আছে, সেখানে নিয়ে যান; কোথায় পাশের গ্রামে এক ছোট্ট নদী আছে, সেখানেও নিয়ে যান। নদী ছোট্ট হ'লেও খরস্রোতা, দেখ্‌তে ভারি সুন্দর। তার ধারে আমরা কতক্ষণ বসে থাকি।

এই ভাবে দিনটা দ্রুত কেটে যায়। এতগুলো ঘণ্টা এত তাড়াতাড়ি কি করে কেটে গেল ভেবেই পাই না। সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফের্‌বার জন্যে ষ্টেশনের দিকে রওনা হই; যাবার সময় 'রাঙাদি' বলেন—আবার এসো কিন্তু।

এগার

জুন মাস প্রায় শেষ হ'তে চলেছে, পরীক্ষাও সব শেষ হয়ে গেছে। সামনেই তিন মাসের লম্বা ছুটি, যেন ভয় দেখিয়েই দাঁড়িয়ে রয়েছে, কি করে কাটাব ভেবে পাই না। দৈবক্রমে আপনা হতেই সে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। কেমন করে, বলি।

সেদিন ইউনিভার্সিটি কলেজে হঠাৎ মুখার্জ্জির সঙ্গে দেখা, তা'র সঙ্গে ঘোষও আছে। মুখার্জি প্রস্তাব করল—সামনের ছুটিটা আমরা তিন জনে কন্টিনেণ্টএ ঘুরে আসি; দেশও বেশ দেখা হবে, ছুটিটা কাটানর সমস্যাও ঘুচে যাবে।

তা'রা বল্‌ল—প্রথমে আমরা যাব প্যারিতে, তারপর সেখান হ'তে সুইট্‌জারল্যাণ্ড, ইটালী, জার্ম্মাণি। 'শুভস্য শীঘ্রম্‌।' অতএব পরশুই বেরিয়ে পড়া ভাল।

আমার মনটা অন্য ধরণের, সে ঘুর্‌তে ভালবাসে না।

জগতের কোথাও একবার থাম্‌তে পার্‌লে সে আর নড়তে চায় না। আমি তাই ভাল করে মত দিই না। কিন্তু তা'রাও ছাড়্‌বার পাত্র নয়। আমাকে তা'রা টমাস্ কুক্‌এ নিয়ে যায় এবং আমি মত দেবার আগেই তিন জনের প্যারি যাবার টিকিট কিনে ফেল্‌ল। কাজেই মত না দিয়ে আমার উপায় ছিল না।

তৃতীয় দিন সকালে আমাদের নিয়ে ট্রেন চলেছে, লণ্ডন হতে ডোভারের পথে। সত্তর মাইল পথ, গাড়ী কোথাও থামে না। পথের দু'ধারের দৃশ্য ভারি মনোরম। বড় বড় মাঠ, তার মাঝে ছোট ছোট সহর চোখে পড়ে। এ মাঠের ঘাস অতি সবুজ এবং মনোরম। বাংলা দেশের দূর্ব্বা সবুজ এবং সে দূর্ব্বার গৌরব করা আমাদের খুব সাজে বটে, কিন্তু এটা কিছুতেই না মেনে পারা যাবে না যে এদেশের ঘাসের রঙ্‌ও ভারি সুন্দর। এমন স্নিগ্ধ সবুজ রঙ্ বুঝি কোথাও দেখা যায় না ;—এ ত দূর্ব্বার সবুজ নয়, মরকত-মণির সবুজ।

ডোভার পৌঁছবার আগেই লাঞ্চ্‌এর সময় এসে যায়, তাই ট্রেনেই খাবার ব্যবস্থা। কোর্স‌এর মধ্যে [illegible] মনের ইচ্ছে মত খাবার কিছু নেই, একেবারে 'ফিক্‌স্‌ড্ মেনু'।

আমি মুখার্জ্জির সঙ্গে যে টেবিলে খেতে বসেছি, তার অপর দিকে বসেছেন এক প্রৌঢ় দম্পতি, ইংরেজ বলেই মনে হ'ল।

আমার মহাসমস্যা। আমিষাশীর জন্যই সমস্ত খাবার তৈরী, তাই কপির পাতা সিদ্ধ আর আলু সিদ্ধ ছাড়া বাকি সব কোর্স ই হয় মাছের, নয় মাংসের। এক-একটা করে কোর্স আসে, আমি দেখি আমার ভোজ্য তা নয়, আর ফিরিয়ে দিই। কি কর্‌ব, বসে বসে শুক্‌নো রুটি চিবোই! আমার সে আচরণ সকলের চোখে অদ্ভুত ঠেকে, চারিপাশ হ'তে আমার প্রতি কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে, আমার মনে আরও সঙ্কোচ জাগে, খাবার মুখে দিতে হাত নড়ে না।

আমার সেদিনকার দুরবস্থা আশেপাশের সকলের উপহাসের খোরাক জুগিয়েছিল, কিন্তু আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, কেবল এক জনের মনে সে দৃশ্য ব্যথা জাগিয়েছিল। তিনি আমার আত্মীয় নন, আমার স্বদেশী নন, আমার স্বজাতিও নন, তবে তিনি নারী বটেন। তিনি হ'লেন আমারই টেবিলে আমার সামনে যে ইংরেজ মহিলাটি বসেছিলেন, তিনি। অন্যের মনে উপহাসবোধ জাগ্‌লেও তাঁ'র মাতৃহৃদয়ে সেদিন আমার দুর্দ্দশা দেখে ঘোর ব্যথা লেগেছিল।

আমি কিছুই খাই না দেখে তিনি নীরব থাক্‌তে পার্‌লেন না, একান্ত স্নেহের সুরে বল্‌লেন, একি কর্‌ছ তুমি? তুমি কি নিজেকে মেরে ফেল্‌তে চাও?

তারপর যখন শুন্‌লেন যে আমার মাছ-মাংস খাওয়ায়

আপত্তি আছে, তিনি ওয়েটারকে ডাকিয়ে আমার জন্য মাখন আর 'চীজ' আনিয়ে আমাকে খেতে অনুরোধ করলেন। আমি তাঁর মাতৃহস্তের স্নেহের দান অতি তৃপ্তির সঙ্গেই সেদিন আহার করেছিলাম : তখন আমার মনে হয়েছিল— সেদিনকার সে দুর্দ্দশা যেন আমার সার্থক হয়ে গিয়েছে।

ছোট্ট একটি ঘটনা, কিন্তু আমার স্মৃতিপটে বেশ উজ্জ্বল ভাবেই অঙ্কিত হয়ে গিয়েছে। সেদিন আমার মনে হয়েছিল এই বিদেশিনী বিজাতীয়া নারীর মধ্যেই যেন আমার মায়ের আবির্ভাব হয়েছে। তিনি কে, তা আমি জানতাম না, তাঁ'র সঙ্গে পরিচয় হবার পরেই তিনি বিপুল জন-সমুদ্রের মাঝে হারিয়ে গেছেন, খুঁজে পাবার উপায় নেই, দরকারও নেই। তবে তাঁ'র কথা কখনও ভুলব না, কারণ তিনি আমার এই উপলব্ধি এনে দিয়েছেন যে প্রতি নারীর মধ্যেই আমার মা ঘুমিয়ে আছেন। শুধু আমার মা কেন, সকলেরই মা তেমনি ঘুমিয়ে আছেন। সন্তানের জন্য দরকার হ'লে, তিনি দেশকাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে জাগেন। জাতি বা দেশ হেতু পার্থক্য বা রাজনৈতিক সম্পর্ক হেতু রেষারেষি সে মাতৃস্নেহের ধারা কখনও রোধ করতে পারে না। আমার ল্যাণ্ডলেডি যখন আমার শরীর খারাপ হয়েছে শুনে স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করে যান—'কেমন আছ', বা খাবার থালাটা এগিয়ে দিয়ে যান, তখন ত মনে হয় না যে ইনি বিজাতীয়া, ইনি আমার পর!

বরং তখন তাঁ'কে একান্তই মার মত মনে হয়। মার মত কেন? একেবারেই তিনি মা হয়ে যান!

ডোভার হতে 'কালে' পঁচিশ মাইলের পথ, যেতে সময় লাগে দেড় ঘণ্টা। ডোভারের সাদা খড়ির পাহাড়গুলো আকাশে বিলীন হয়ে যাবার কয়েক মিনিট পরেই, ওপাশে 'কালে'র সমুদ্রের কোলের জমিগুলো আকাশের কোলে অস্পষ্ট ফুটে ওঠে। পথ অল্প বলে জাহাজগুলিও ছোট ছোট, ঠিক সমুদ্রের বুকে সাঁতার কাটার উপযুক্ত নয়। ফলে, জাহাজ চল্‌বার সময় এত দোলে, যে 'সমুদ্র-রোগের' আক্রমণ হ'তে কেউ বড় একটা বাদ পড়ে না। বমি যদিও সকলের হয় না, গা বমি-বমি ভাব বোধ হয় প্রায় সকলেরই হয়ে থাকে। যাদের বয়স একটু বেশী, তারা তাই জাহাজ ছাড়বার আগেই সারবন্দি হয়ে চেয়ারে বসে একখানি করে সরা সাম্‌নে রেখে প্রস্তুত হয়ে থাকেন। দেখতে অদ্ভুত হ'লেও তা নিয়ে উপহাস করবার জন্য যাত্রীর বড় সাহস হয় না, কারণ হয় ত তা হ'লে 'ঘুটে পোড়া দেখে গোবর হাসা'র মতই নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া হবে।

এই পঁচিশ মাইল মাত্র সমুদ্রযাত্রার দুর্ভোগ বিলাতের এবং বিলাত-যাত্রী কত লোকেরই না ভোগ করতে হয়। বড় বড় ইঞ্জিনিয়াররা বলেন যে জলের তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করে এ দুর্ভোগ হতে পরিত্রাণের উপায় হতে পারে।

কিন্তু ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নেতারা এ প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করতে সাহস পান না। এ দুটি জাতির মধ্যে সম্প্রতি সৌহার্দ্দযুক্ত আচরণ দেখা গেলেও তা অতি অল্প দিনের। অতীতে মিত্রতার চেয়ে শত্রুতাই চলে এসেছে পরস্পরের মধ্যে ঢের বেশী দিন। অধুনাতন সৌহার্দ্দ হয় ত গভীর নয়। সমুদ্রের ব্যবধান বিলোপ পেলে দুটো জাতি হয় ত ক্ষ্যাপা কুকুরের মত পরস্পরকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেল্‌বে। এমনি ধরণের দুশ্চিন্তা দুই জাতির নেতাদের মনে জাগে। তাই তাঁ'রা ভ্রূকুঞ্চিত করে বলেন—কাজ নেই খোদার ওপর কারসাজি করে; সমুদ্রের ব্যবধান রক্ষিত হ'ক।

জাহাজ থেকে নেমে 'কালে'র বন্দরে পা দিলেই বেশ বোঝা যায় যে আমরা একটি নূতন দেশে এসেছি। এদেশী লোকেরা ভিন্ন ভাষায় কথা বলে। শ্রমিকদের পোষাকও ইংলণ্ডের শ্রমিকদের পোষাক হ'তে তুলনায় নিকৃষ্ট। তবে এ সবই হ'ল বাহিরের পার্থক্য, ভিতরকার পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য জান্‌তে সময় নেয়।

যে গাড়ীতে আমরা উঠেছিলাম তাতে কয়েকটি ফরাসী মহিলা ও ভদ্রলোকও ছিলেন। তাঁ'দের দেখলেই বোঝা যায় যে তাঁ'রা সহরের লোক ন'ন। কোন কাজে 'প্যারি' সহরেই চলেছেন। তাঁ'রা পরস্পরের মধ্যে খুব গল্প-আলাপ

করে স্মরণ করিয়ে দেন, যে এটা ইংলণ্ড নয়, এখানে অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলাটা সমাজে নিষিদ্ধ ত নয়ই, বরং বাহিরে মুখ বন্ধ করে না থাকাই রীতি। এরা নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে যেমন উদ্‌গ্রীব, বিদেশীকে দেখ্‌লে তা'র সঙ্গে পরিচয় কর্‌তেও উৎসাহ তা'দের এক তিল কম নয়।

একজন বর্ষীয়সী মহিলা আমাদের জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, আমাদের 'পাত্রি' বা স্বদেশ কোথায়।

ঘোষ পরিচয় দিল যে আমাদের দেশ হ্'ল 'এ্যাঁদ্' অর্থাৎ ভারতবর্ষ।

আমাদের 'এ্যাঁন্দু' জেনে তিনি এবং অন্য সকলে খুব খুসী হ'লেন। এইখানে বলে রাখা দরকার যে তাঁ'রা এই 'এ্যাঁন্দু' বা হিন্দু শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন। ভারতবর্ষের বাসিন্দে হ'লেই তা'কে তা'রা 'এ্যাঁন্দু' বল্‌বে, তা তা'র ধর্ম্ম হিন্দুই হ'ক, ইসলামই হ'ক, আর বৌদ্ধই হ্'ক!

তারপর সকলেরই কৌতূহল এই তিনটি ভারতবাসী যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হ'ল। তাঁ'রা কত জনে কত কথাই জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। কোথা হ'তে ফ্রান্সে এসেছি, কোথায় ছিলাম, কেন এসেছি, এম্‌নি—হাজার প্রশ্ন। আমরা মোটামুটি কোন রকমে তাঁ'দের জানিয়ে দিই যে আমরা 'এতীদে' অর্থাৎ ছাত্র, 'লঁদর' বা লণ্ডনে পড়ি, তাঁ'দের প্যারি সহর দেখতে চলেছি ছুটিতে।

আমরা ভাল ফরাসী জানি না, ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে ধীরে ধীরে বোঝাই। তাঁ'দের দ্রুতগ্রামী ফরাসীতে আলাপ আমরা সহজে ধর্‌তে পারি না, ছ'-তিনবার করে একটা কথা শুনি, তারপর বুঝতে পারি একটু-আধটু।

তবুও তাঁ'দের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না, এমনি বিদেশীকে জান্‌বার তাঁ'দের আগ্রহ! তাঁ'দের চরিত্র যেন ইংরেজদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পরকে জান্‌তে, পরের সঙ্গে আলাপ করতে এরা যেন বেশ তৃপ্তি পায়। ইংলণ্ডে যাদের মুখ বুজে থেকে থেকে এবং পাথরের মত নির্ব্বাক্ মূর্ত্তি দেখে দেখে অভ্যাস, তাঁ'দের কাছে এ পরিবর্ত্তন বেশ তৃপ্তিকর এবং আনন্দদায়ক। তাই এঁদের এ ব্যবহার আমাদেরও বেশ ভালই লেগেছিল।

ছুঃখ এই যে এঁরা কেউই ইংরেজি জানেন না, তা হ'লে আলাপের কত সুবিধা হত! এই জাতিটার একটা বিশ্রী দোষ এই যে এঁরা বিদেশী ভাষা শিখ্‌তে বড়ই নারাজ। ইংলণ্ডের সঙ্গে এদের মাত্র পঁচিশ মাইল সমুদ্রের ব্যবধান, কিন্তু ইংরেজি ভাষার খবর কেউ বড় একটা রাখে না। ইংলণ্ড ত তুলনায় তবু দূরে, পূব দিকে পাশেই জার্ম্মাণরা পড়ে রয়েছে, তাদের ভাষাও কেউ বড় জানে না। ইউরোপের প্রায় অন্য সব দেশের লোকেরাই মাতৃভাষা ছাড়া আর ছু-একটা ভাষা জানে; কিন্তু ফরাসীরা মাতৃভাষা ছাড়া আর

কোন ভাষারই সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। আমরা খুব কম ফরাসীই দেখেছি, যারা ইংরেজিতে কথা বল্‌তে পারে। এদের এই অন্যের ভাষা শিক্ষা বিষয়ে ঔদাসীন্য মাতৃভাষার প্রতি সুগভীর ভালবাসা হেতুই হোক্, বা যে কোন কারণেই হোক, আমাদের মত ভ্রাম্যমানের পক্ষে এটা বিশেষ অসুবিধা-জনক।

বার

প্যারি সহরের বুকের ওপর আমরা আজ কয়দিন হ'ল বাস কর্‌ছি। তার পথে পথে, উদ্যানে উদ্যানে ঘুরে তাকে বেশ অনেকখানি চিনে নেবার সুযোগও পেয়েছি। এখন বল্‌তে পারি সে কেমন সহর।

শুধু কি বল্‌ব এ সহর ভাল, এ সহর সুন্দর? তা' হলে যেন তার কথা ঠিক মত বলা হ'ল না। প্যারির ত পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে সুন্দর সহর বলে খ্যাতি আছে, কিন্তু আমার মনে হয় সেটা তার আসল গুণ নয়। ..র আসল গুণ হ'ল এই যে তার মাঝে এমন কোন এক আকর্ষণী শক্তি আছে, যাতে সে কেবল তার রূপ দেখিয়ে পথিকের নয়নই স্নিগ্ধ করে না, মনও হরণ করে।

মানুষ যতকাল পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে, তার পনের আনা

সময়ই সে বন-জঙ্গলে প্রকৃতির আশ্রয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। সভ্যতার আলো তার কাছে পৌঁছাল মাত্র সেদিন, বড়-জোর আট-দশ হাজার বছর। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সহরের জন্ম। মানুষের যখন বুদ্ধির বিকাশ হ'ল, তখনি সে প্রকৃতির সাহায্য উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ নিজ হাতে নিজের আশ্রয়-স্থান গড়ে নিলে। এই ভাবেই প্রথম মানব-পল্লীর জন্ম এবং সেই পল্লীই বর্দ্ধিত হয়ে সহরের আকার ধারণ করেছে। এই দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে, সহরগুলি মানুষের আত্মনির্ভরতার প্রকৃষ্ট পরিচয়; শুধু আত্ম-নির্ভরতার নয়, বাস্তবিক সৃষ্টি-নৈপুণ্যেরও চরম নিদর্শন। একটি বড় সহর দেখলে মানুষের মনে তাই একটা আত্মপ্রসাদ জাগে, মনে হয় এই যে বিরাট একটা জিনিষ গড়ে উঠেছে, এ নিছক মানুষেরই হাতের গড়া।

সহরের মধ্যে বাস করে করে তবু কিন্তু মানুষের অন্তরাত্মা হাঁপিয়ে ওঠে। নিরন্তর সহরের হট্টগোল আর বাড়ীর স্তূপ তার ভালই লাগে না; উধাও হয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে একেবারে নিঃসঙ্গ গভীর জঙ্গলে, যেখানে প্রকৃতিরই পূর্ণতম মূর্ত্তির প্রকাশ। এ হ'ল মানুষের ভিতরকার আদিম মানুষটিরই দাবী, তার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রকৃতির কোলে একান্তে বাস কর্‌বার অভ্যাসের দাবী।

কিন্তু তার ওপর যে সভ্যতার আলোকে পরিপুষ্ট নূতন মানুষটি গড়ে উঠেছে, সে অন্তরের এ দাবীকে অনুমোদন কর্‌লেও কাজের খাতিরে তা পারে না। সভ্যতার উন্নতি-সাধনের পক্ষে এই সহর-জীবনটা তার এতই দরকারী হয়ে পড়েছে, যে সহরকে বাদ দিলে কিছুতেই চল্‌তে পারে না। সামান্য ছোটখাট সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিক দিয়ে ত কথাই নেই, তার মহত্তম উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও এই সহর-জীবন একান্ত প্রয়োজন। আগেকার মুনিঋষিরা তপোবনে থেকে সত্যসাধনা কর্‌তেন বটে, কিন্তু আজকাল তা সম্ভব নয়। সত্যের সাধনার উপায়স্বরূপ দরকার হ'ল—পুস্তকাগার ও গবেষণাগার; এই দুইটি জিনিষ ত আর বনে মেলা সম্ভব নয়, সহরে বসেই পেতে হবে। বৈজ্ঞানিকের ত কথাই নেই, এখনকার দার্শনিকরাও সহর-বাসী। এমন কি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-শক্তির উন্মেষও সহর-জীবনের প্রাচুর্য্যের মধ্যেই ঘটেছে।

মানুষের মনে এই দুটি বিপরীত ভাবধারা এক সঙ্গে ব'য়ে চলেছে। সহর না হ'লে তার সভ্যতা চলে না, অথচ বন-জঙ্গলে প্রকৃতির সংস্পর্শ পাবার জন্য তার অন্তরে আছে এক সুগভীর তৃষ্ণাবোধ। সহরের মধ্যেই প্রকৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করে মানুষের এই দুই মনোবৃত্তিকে এক সঙ্গে পরিতুষ্ট করবার চেষ্টা এই প্যারি সহরেই যেন প্রথম

হয়েছে বলে মনে হয়। প্যারি সহরের পরিকল্পনা যে শিল্পীর মনে প্রথম জেগেছিল, তিনি মানুষের এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কথা নিশ্চয়ই খুব ভাল করে জান্‌তেন।

প্যারি সহর জনসংখ্যায় জগতের সেরা নয়, কারণ লণ্ডন আর নিউ-ইয়র্কের লোকসংখ্যা তুলনায় অনেক বেশী। প্যারিতে যেমন 'নতর্‌ দাম্‌' গীর্জ্জা, লণ্ডনেও তেমনি 'সেন্ট্‌পল্‌স্‌' আছে। 'লুভর' মিউজিয়ম প্যারির গর্ব্ব কর্‌বার জিনিষ বটে, শিল্পকলার নিদর্শনের ভাণ্ডার হিসাবে জগতে তা অতুলনীয়। ফরাসী জাতি শিল্পকলার নিগূঢ় উপাসক হ'লেও ইউরোপের অন্যান্য জাতিরাও তার যথোচিত আদর কর্‌তে জানে। লণ্ডনের ন্যাশন্যাল গ্যালারি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; বার্লিনের গ্যালারিও উপেক্ষণীয় নয়। রোম, মাদ্‌রিদ, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি স্থানের চিত্র প্রদর্শনীগুলিও পৃথিবী-প্রসিদ্ধ। ঈফেল্‌ টাওয়ার মানুষের হাতে গড়া জগতের সেরা উঁচু জিনিষ ছিল। অভ্রংলেহী বাড়ী করায় ফরাসীদের চেয়ে মার্কিনরাই মন দিয়েছে বেশী, আমেরিকার এম্পায়ার ষ্টেট্‌ বিল্ডিং কিন্তু এখন তার চেয়েও উঁচু। এগুলির কোনটাই ত প্যারি সহরকে বৈশিষ্ট্য দান করে না। যে বিদেশী প্রথম তাকে ঘুরে ফিরে দেখ্‌বে, এরা তার মনোরঞ্জন কর্‌বে বটে এবং বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিস্ময়ও জাগাবে, কিন্তু বিশেষ করে স্মরণ

রাখ্‌বার মত পুঁজি তাকে কিছু দিতে পার্‌বে না; দিতে পারবে তার একমাত্র গৌরবের সম্পদ 'শাঁজ্‌ এলিজে' রাস্তাখানি। নামটির অর্থ হ'ল 'স্বর্গের উদ্যান'; অর্থটি গুণের অনুরূপ হ'য়ে নামটিকেও যেন আরও সার্থক করেছে।

অতি বিস্ময়কর এই 'শাঁজ্‌ এলিজে' রাস্তাখানি! পৃথিবীর মধ্যে এমন সুন্দর রাস্তা সত্যই আর নাই। দৈর্ঘ্যে মাত্র দু' মাইল লম্বা, প্রস্থে বোধ হয় দু'শ গজ হবে। এক পাশে তার 'সীন্‌' নদী। বিশ্ববিখ্যাত লুভর্‌ মিউজিয়মের পর্ব্বতপ্রমাণ বাড়ী যেখানে আকাশের কোল জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেইখানে তার আরম্ভ এবং আর যেখানে 'আর্ক দ ত্রিয়ম্প' গর্ব্ব ভরে বুক মেলে দাঁড়িয়ে আছে, সেইখানে তার শেষ। এই আর্ক দ ত্রিয়ম্পএর গায়ে নেপোলিয়নের বিজয় কাহিনী প্রস্তরে খোদিত মূর্ত্তি দিয়ে লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছ। এই আর্কএরই ঠিক্‌ নীচে একটি চিতা জ্বল্‌ছে। গত ইউরোপীয় মহাসমর যে দিন শেষ হয়েছে সেইদিন হতে এই চিতা জ্বল্‌তে সুরু করেছে, আর যতদিন জগতে ফরাসী জাতির অস্তিত্ব থাক্‌বে, ততদিন তাকে নিভ্‌তে দেওয়া হবে না। ফরাসীদের যে দশ লক্ষ প্রাণ গত মহাযুদ্ধে আত্মবলি দিয়েছিল, তাদেরই স্মরণে এখানে এক অজানা সৈনিকের কবর দেওয়া হয়েছিল; সেই কবরের ওপরই এই অনন্তকাল-স্থায়ী চিতা জ্বল্‌ছে, সেই দশ লক্ষ মৃত সৈনিকদের উদ্দেশ্যে।

দুই দিকের এই দুইটি জিনিষ যেন ফরাসী-জাতির যে দুটি মহৎ গুণ আছে তারই প্রতিকৃতিস্বরূপ। ফরাসীরা জানে যুদ্ধে কেমন করে প্রাণকে তুচ্ছ কর্‌তে হয়। কত শত বছর ধরে, কত শত যুদ্ধে কত লক্ষ ফরাসী যে অক্লেশে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে, তা গণনা করা যায় না। জীবনটা যেন তাদের কাছে একান্তই হেলার জিনিষ, এক মুঠা ধূলার মত। দিগ্বিজয়ী বীর নেপোলিয়নের কীর্ত্তির স্মৃতিরূপী এই আর্ক দ্‌ ত্রিয়ম্প যেন ফরাসী-জাতির সেই বিপুল আত্মবিসর্জ্জনের কথাটাই খুব বড় করে স্মরণ করিয়ে দেয়। ফরাসীরা যে ললিতকলার সেরা সমঝ্‌দার, ওদিকে লুভরের বিশাল অট্টালিকাই তার প্রমাণ। লুভর্‌এর বাড়ীখানি পূর্ব্বে ছিল রাজাদের প্রাসাদ। রাজ-শাসনের অবসানে এই অট্টালিকাখানিতে চিত্র ও ভাস্কর্য্যের এক বিরাট প্রদর্শনী খুলে দেওয়া হয়েছে। আগে যা ছিল রাজপ্রাসাদ, এখন তা হয়েছে বাণীমন্দির!

ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠতম সন্তান নেপোলিয়নের মধ্যেও ঠিক এই দুটি গুণেরই প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। তিনি এক দিকে যেমন ছিলেন অদ্বিতীয় যোদ্ধা, অন্য দিকে তেমন কারুশিল্পের একনিষ্ঠ সেবক। তাঁ'র নায়কত্বে তাঁ'রই বিজয়বাহিনী যখন যে দেশ অধিকার কর্‌ত, যে দেশে তাঁ'র প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌ত—সে দেশের অর্থ নয়, অলঙ্কারও নয়, সে দেশের

চিত্র আর ভাস্কর্য্যের সম্পদগুলি। দেশে যখন ফির্তেন, সেইগুলিকেই বিজয়লাভের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার গণনা করে সঙ্গে আন্তেন। নেপোলিয়নের পতনের পর ইহার অধিকাংশই যে দেশের যে জিনিষ সে দেশে ফিরে গিয়েছে; তবু তাঁ'র আনীত অনেকগুলি ভাস্কর্য্য ও চিত্রের নিদর্শন এখনও লুভর্ মিউজিয়মের পুষ্টি সাধন কর্ছে। চিত্র আর ভাস্কর্য্য রক্ষায় ইঁহাদের এই যত্ন বরাবর সমান চলে এসেছে।

ফরাসী-জাতির আর্টের প্রতি অনুরাগ যে কত গভীর, তা সেদিনকার একটি ঘটনা দিয়ে অতি সুন্দর উপলব্ধি করা যায়। গত মহাসমরের গোড়ার দিকে, জার্ম্মাণী যখন ফ্রান্সের পূব দিকের অনেকখানি অংশ দখল করে এমন কি 'মার্' নদীর ধারে প্যারি সহরের ষাট্ মাইলের মধ্যে এসে পড়েছিল, তখন সারা প্যারির বুকে একটা গভীর আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল; সকলেরই আশঙ্কা যে জার্ম্মাণরা বুঝিবা চল্লিশ বছর আগে লুই নেপোলিয়নের সময়ের মতই প্যারি সহরের ওপর এসে পড়ে।

এ অবস্থায় ভয় হবার কথাই বটে। এরূপ সময় সকলেরই লক্ষ্য—যার যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ আছে, তা দূরে সরিয়ে বিজয়ী অরাতির লোলুপ দৃষ্টির গ্রাস থেকে রক্ষা করা। ফরাসী গভর্ণমেণ্টের তখন সব থেকে বড় আগ্‌লাবার জিনিষ হয়েছিল, আর কিছু নয়, দুটি আর্টের নিদর্শন—

একখানি হ'ল 'লিয়োনার্দো দা বিঞ্চি'র অঙ্কিত ছবি 'মোনা লিজা' এবং অন্যটি মিলো দ্বীপে প্রাপ্ত ভিনাসের মূর্ত্তিখানি। আর্টের জগতে দা বিঞ্চি চিত্রিত এই ছবিখানিই জগতের শ্রেষ্ঠ চিত্র বলে খ্যাত, তেমনি ওই ভিনাসএর মূর্ত্তিটি জগতের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যের নিদর্শন। তুইটিই লুভর্ মিউজিয়মে রক্ষিত হচ্ছে। কত লক্ষ মানুষই না সেখানে যায় শুধু এ তুখানিকে দেখে নয়ন সার্থক করবার জন্য! শোনা যায়, গত মহাযুদ্ধের সময় ফরাসী গভর্ণমেন্ট এ তুটিকে নিয়ে মার্সাই সহরের কোন এক অজ্ঞাত স্থানে রেখে দিয়ে ছিলেন; কেউ জান্‌ত না কোথায়। এই তুটিই যেন ফরাসীদের সব থেকে গর্ব্বের মত সম্পদ, তাই এ তুটিকে শত্রুর কবল হতে রক্ষা কর্‌বার জন্য এমন প্রাণপণ চেষ্টা।

আসল কথা ছাড়িয়ে আমরা অনেক দূর চলে এসেছি। ফরাসীরা চারুশিল্পের উপাসক বটে, তারা তাই বলে প্রকৃতিরও বড় কম ভক্ত নয়। পূর্ব্বেই আমরা বলেছি যে প্যারি সহরের নগর পত্তনের পরিকল্পনায় সেইটাই সব থেকে লক্ষ্য কর্‌বার বিষয়।

সাধারণ সহরে রাস্তাই আমরা দেখি, একেবারে গাছের নামগন্ধবিহীন রাস্তা, প্রকৃতির সকল সংস্পর্শ বিবর্জ্জিত। কিন্তু গাছপালা যুক্ত রাস্তা, ফরাসীরা যাকে এভ্‌নিউ বলে, সে রাস্তার পরিকল্পনা প্যারি সহরের নির্ম্মাতাদের

মাথায়ই প্রথম জেগেছিল। আজকাল কল্‌কাতায় অনেক নূতন রাস্তা এভ্‌নিউর আকার নিয়েছে; কিন্তু প্যারি সহরের প্রত্যেকটী বড় রাস্তাই এক-একটি এভ্‌নিউ। সহরের মধ্যেই প্রকৃতির আসন স্থাপন করে সহর-জীবনের গ্লানি মুক্ত করার ব্যবস্থা—এ ফরাসীদেরই কৃতিত্ব।

আমরা যে শাঁজ্‌ এলিজে রাস্তার কথা বল্‌তে সুরু করেছিলাম, তা হ'ল এই এভ্‌নিউদের রাজা। ঠিক একটি রাস্তা নয়, এ হ'ল সাতটি পাশাপাশি রাস্তার সমষ্টি। তাদের প্রত্যেকটির তুইধারে বড় গাছের সারি; মাঝের তুটি মাত্র গাড়ী চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হয়, বাঁকি সমস্তগুলিই পায়ে হাঁটা পথিকদের জন্য।

এরই মাঝে মাঝে সবুজ ঘাসের মাঠ আছে। তাদের মাঝে কোথাও পুকুর, সে পুকুরে পদ্ম ফোটে; কোথাও বা ঝরণা—সে ঝরণার জলে রঙ্‌-বেরঙের মাছ খেলা করে এবং তাদেরই মাঝে মাঝে সুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত;—দেখলে বোঝা যায় না, এটা বাস্তবিক উদ্যান কি রাস্তা!

এই ভাবে প্যারি সহরের ঠিক বুকেরই মাঝখানে ফরাসীরা প্রকৃতির পূর্ণতম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে; সহরের অনন্ত কোলাহলের মাঝে বসেও প্রকৃতির স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার উপায় করে নিয়েছে। এমন অভিনব কল্পনা যে জাতির মনে প্রথম জেগেছিল, তাঁরা সত্যই আমাদের নমস্য।

'আর্ক দ ত্রিয়ম্প্' ছাড়িয়ে কিছু দূর গেলেই আমরা 'ব্োয়া দ বুলঙ্'এ এসে পড়ি। সহরের উপান্তে অবস্থিত এটি একটি বিশালকায় প্রমোদ-উদ্যান। লণ্ডনের হাইড পার্ক বা কলকাতার ইডেন গার্ডন্এর মতই এটি বিখ্যাত এবং ফরাসী জাতির প্রকৃতির প্রতি অনুরাগের পরিচায়ক।

তের

জগতে দুটো মানুষ যেমন কখন কখন এক স্বভাবের মেলে, দুটো জাতির মধ্যেও সেই রকম চরিত্রগত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ফরাসীদের সঙ্গে মিলে মিশে কিছুদিন থাকলে আমাদের বাঙ্গালীর মনে এই কথাটাই জাগে, যে ওরা যেন খুব বেশী আমাদেরই মত।

বাঙালীর জাতিগত বৈশিষ্ট্য—সে বড় বেশী রকম ভাবপ্রবণ। বুদ্ধিতে সে বড় বটে, কিন্তু হৃদয়বৃত্তিতে সে আরও বেশী বলীয়ান্। বাংলার যে নগরে নব্য ন্যায় জন্ম নিয়ে বাঙালীর মস্তিষ্কশক্তির গৌরব বর্দ্ধন করেছিল, ঠিক সেই সহরে এবং ঠিক সেই একই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমের মন্ত্রে সারা বাংলার মন আলোড়িত হয়েছিল। বাংলা দেশেই প্রেমিক কবি জয়দেব, চণ্ডীদাসের জন্ম; বাংলার বাউল গান, বাংলার কীর্ত্তন, বাংলার সেই বিশিষ্টতারই মূর্ত্ত্য সাক্ষ্য।

ফরাসী জাতির সঙ্গে বাঙালীও যেন এই সম্পর্কে ঠিক একই সুরে বাঁধা। জ্ঞানে তা'রা বড় হ'লেও, হৃদয়বৃত্তিতে আরও বড়। একটি শুধু কথার মাদকতায় সারা জাতি ফরাসী বিদ্রোহের সময় যেমন করে ক্ষেপেছিল, সে রকম করে ক্ষেপ্‌তে শুধু ফরাসীরাই পারে। সে কি যে-সে ক্ষ্যাপা? হাজার হাজার বছরের জমা কুসংস্কার একদিনে ঝেড়ে ফেলে দেবার বল তাদের মনে সেই ক্ষ্যাপামিই এনে দিয়েছিল; আর এনে দিয়েছিল সারা ইউরোপের সম্মিলিত শক্তিকে পরাজিত কর্‌বার ক্ষমতা। ফরাসী ইতিহাসের এই অধ্যায়টী যেমন আশ্চর্য্য, তেমনই রোমাঞ্চকর। এমন করে মাত্‌তে এবং ক্ষেপতে তা'রা পারে, তার কারণ তা'দের হৃদয়বৃত্তি মনোবৃত্তি হ'তে অনেক বেশী বড়।

বাঙালীর আর একটী গৌরবের সম্পদ এই, যে তারা মাতৃভাষাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। বাংলা ভাষার যত দিন হ'ল জন্ম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হয়েছে। রমাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণের তারিখ, আর বাংলা ভাষার জন্ম-তারিখ প্রায় সমসাময়িক বল্‌লেও চলে। তার অব্যবহিত পরেই চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিকে দিয়ে যে সাহিত্য-সেবার উদ্বোধন হয়েছে, সে কাজের ভার নিতে কোনদিন যোগ্য সাহিত্য-সেবকের অভাব হয় নি। এখনকার দিনে বাংলা সাহিত্য-সেবায়

যিনি প্রধান পূজারী, তিনি বিশ্বের অর্ঘ্য লুট করে বাংলা সাহিত্যের পায়ে এনে দেবার ক্ষমতা নিয়েই জন্মেছিলেন এই সেদিনকার কথা, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের দ্রুত ক্রম বিকাশও এক বিস্ময়কর ব্যাপার। উনবিংশ শতাব্দী গোড়ায় বাংলা-সাহিত্যে গদ্য-সাহিত্য বলে কোন জিনিষে অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু তার পঞ্চাশ বছর পরে বাংলা এমন পরিপুষ্ট গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হ'ল, যে তা জগতের যে কোন সাহিত্যের ঈর্ষার বস্তু হওয়া উচিত। এমন জিনিষটি কখনই সম্ভব হত না, যদি না বাঙ্গালী প্রাণ দিয়ে তার ভাষাকে ভালবাসত।

ফরাসী জাতিরও এই নিজ মাতৃভাষার প্রতি একটি আন্তরিক আকর্ষণ ও ভক্তি আছে। ল্যাটিন্‌এর পর এই ভাষাই ইউরোপের সেরা ভাষা বলে নাম করেছিল সকলের আগে এবং তার সে নাম আজও কেউ কেড়ে নিতে পারে নি। ফরাসী ভাষা হ'ল এখন সারা ইউরোপের সাধারণ ভাষা। দু'শ বছর আগে দার্শনিক লাইবনীট্‌জ জাতিতে জার্ম্মাণ হয়েও এই ফরাসী ভাষাতেই তাঁর দর্শন লিখেছিলেন। কথা-সাহিত্যে ফরাসী-সাহিত্য জগতের শীর্ষস্থানীয়। বালজাক, মোপাসাঁ, আনাতোল ফ্রান্স,—এদের লেখা পৃথিবী-প্রসিদ্ধ। অন্য দেশের লোকেরা সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন,—সঙ্কীর্ণ অর্থে সাহিত্য মানে যা

বোঝায় কেবল মাত্র তাই লিখে, অর্থাৎ কবিতা, গল্প—না হয় নাটক। কিন্তু জটিল দর্শনের বই লিখেও সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন কেবল মাত্র ফরাসী-ভাষী দার্শনিক বের্গ স । এ দেশী ভাষা এত মধুর, এ দেশী সাহিত্য এত মিষ্ট যে দর্শনের মত জটিল বিষয়কে অবলম্বন করেও রসসৃষ্টি সম্ভব হয়।

আর একটা কথা আগেই উল্লেখ করেছি, যে ফরাসীরা অন্য জাতির ভাষা শিখ্‌তে বড় একটা চায় না। তাদের দেশে একশটা লোকের মধ্যে একটিও হয় ত ইংরেজি-জানা লোক মিল্‌বে না। অথচ ইংরেজদের দেশ আর তাদের দেশ পাশাপাশি অবস্থিত, মাঝখানে মাত্র পঁচিশ মাইল সমুদ্রের ব্যবধান। তাদের এই অন্য ভাষার প্রতি বিরাগ, নিজ মাতৃভাষার প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ হেতু বলেই আমার মনে হয়। এক্ষেত্রেও বাঙালীর সঙ্গে তাদের যেন বেশ মিল পাওয়া যায়। সাধারণ বাঙালী ছেলের সামান্য হিন্দি বলাও অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তার সে চেষ্টা অনেকের বিনা পয়সায় আমোদের খোরাক জোগাবে। ইংরেজিটা অন্নের দায়ে শিখতে সে বাধ্য, তাই কিছু শেখে। এই বাধকতা না থাক্‌লে, তার ইংরেজিতে কেমন ব্যুৎপত্তি হ'ত বলা যায় না। অন্ততঃ মান্দ্রাজী প্রভৃতি ভারতের অন্য জাতিরা মৌখিক ইংরেজি ভাল বলে—এমনি প্রবাদ আছে। বাঙালী

কিন্তু পারতে ইংরেজিতে কথা বলে না, বলে যতখানি সম্ভব বাংলায়। এটা তার নিজ মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগেরই পরিচায়ক। 'মোদের গরব, মোদের আশা, আমারি বাংলা ভাষা'—এ কেবল বাঙালী কবিবিশেষের মনোভাব ব্যক্ত করে না, বোধ হয় সকল বাঙালীরই অন্তরের কথা বলে দেয়।

ফরাসী-জাতির হৃদয়ে যে একটি স্বভাবসুলভ উদারতা আছে, সেটিও বেশ সহজেই চোখে পড়ে। জার্ম্মান, ইংরেজ এবং ফরাসী—এই তিনটি জাতি এখন ইউরোপের শীর্ষ-স্থানীয়। তিনটি জাতিই জ্ঞান বুদ্ধি সমৃদ্ধিতে পরস্পরের প্রায় সমকক্ষ। কিন্তু তিনটি জাতির প্রতিভা যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে ছুটে চলেছে, তা আপাতদৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। এখনকার যুগধর্ম্মের প্রভাবে তারা সকলেই গভীর জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত, অর্থাৎ স্বদেশ পূজা এবং স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি কামনাই একমাত্র তাদের লক্ষ্য হয়েছে। তা সত্ত্বেও তাদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলি একটু গভীর ভাবে দেখলেই চোখে পড়বে।

মস্তিষ্ক-শক্তিতে জার্ম্মানরা এখন জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করেছে। দর্শনে ও বিজ্ঞানে তারা জগতের সকল জাতিকেই হার মানিয়েছে। তাদের দার্শনিক কান্ট, হেগেল দর্শন-জগতে শীর্ষস্থানীয়। তাদের দেশের বৈজ্ঞানিক

আইনষ্টাইন্ এখনকার যুগে জগতের সেরা বৈজ্ঞানিক; তাদেরই হাতে নির্ম্মিত গ্রাফ জেপলিন সারা পৃথিবী ঘুরে উড়ে এল একুশ দিনে; তাদের হাতে গড়া এয়ারোপ্লেন এখন পৃথিবীর সব থেকে বড় বিমান-যন্ত্র; তাদের তৈরী জাহাজ 'অইরোপা' ও 'ব্রেমেন্' পৃথিবীর সব জাহাজ থেকে দ্রুতগামী।

কিন্তু তাদের এই বিজ্ঞান-সাধনার ফলে যে বাস্তব-শক্তির বিকাশ হয়েছে, সেটা এক ভুল পথে তাদের প্রতিভাকে টেনে নিয়ে চলেছে। জ্ঞান-সাধনা মানুষকে বল এনে দেয় দেখে, তাদের মনীষিরা ভুল করে ধরে বস্লেন, যে মানুষের পরমার্থই হ'ল—জ্ঞানসঞ্চয় নয়,—বলসঞ্চয় করা। এই নীতিই তাদের দার্শনিক 'নীচে'এর ভাষায় বাণী পেল। তিনি সারা জগতকে এই মন্ত্র শেখালেন যে মানুষের পরমার্থ হ'ল শক্তিসঞ্চয় করা। বিশ্বজগৎ যে শক্তির বিকাশ, সে হ'ল Will to Power। * এ জগতে দুর্ব্বলের স্থান নাই, সবলের বলের বিকাশই হ'ল সকলের জীবনের একমাত্র সার্থকতা। দুর্ব্বলকে পদদলিত করে সবল উঠুক, দয়া মায়া হ'ল মানুষের দুর্ব্বলতা; এ সব গুণ ভুল্তে হবে। দুর্ব্বল জাতি পৃথিবী হ'তে লোপ পেয়ে যাক। যে জাতি শক্তিশালী তার বলসঞ্চয় হবে শক্তিহীন জাতির বিলোপ সাধন

* Nietche—'Thus Spake Zarathustra' দ্রষ্টব্য।

করে। নূতন জাতীয়তা-বোধে অনুপ্রাণিত জার্ম্মানী এ বাণী সাদরে গ্রহণ করল। জার্ম্মানরা বল্‌ল, আমরা জগতের সেরা জাতি হ'ব। অন্য সকল জাতিকে পদদলিত করে জার্ম্মানী দাঁড়াবে সবার ওপরে। তাই জার্ম্মানীর জাতীয় মন্ত্র বলে—Deutch-land über alles, অর্থাৎ জার্ম্মানী সবার উপর।

ইংরেজ জাতির মনে যে সুর সবার চেয়ে বড় করে বাজে,—তা হ'ল স্বদেশপ্রীতি। ইংলণ্ডের সকল যুগের সাহিত্যেই এই মনোভাবটি বেশ বড় করে পরিস্ফুট হয়েছে, যেমন সেকালের সেক্ষপীয়ারের লেখায় এবং স্কটের কবিতায়, তেমনি সেদিনকার নবীন কবি রিউপার্ট ব্রুকের কবিতায়। দেশের নামে এরা করতে না পারে এমন কাজই নেই। যে মন্ত্র তাদের দেশে মরা মানুষকেও কবর হতে উজ্জীবিত করে আনতে পারে এবং হাজার নিরাশার মধ্যেও আশার বাতি জ্বাল্‌তে পারে, তাহ'ল এই :— England expects every man to do his duty—ইংলণ্ডের প্রতি, দেশমাতার প্রতি তা'দের যা কর্ত্তব্য, সেই হ'ল চরম কর্ত্তব্য। জার্ম্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে প্রতি পুরুষকেই যুদ্ধবিদ্যা শিখ্‌তে হয় এবং প্রয়োজন হ'লে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু ইংলণ্ডের পরম গৌরব এই যে ইংলণ্ডে যুদ্ধশিক্ষা বাধ্যতা-মূলক নয়, তবুও গত ইউরোপীয় মহাসমরের সময় এমন পুরুষ ইংলণ্ডে ছিল না যে স্বেচ্ছায়, সানন্দে সমরে না যোগ

দিয়েছে। দেশ-মায়ের ডাক, তাদের সবার বড় ডাক। স্বদেশপ্রেম তাদের চরম বৈশিষ্ট্য।

ফরাসী জাতির প্রতিভার বিকাশ কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য পথে। রাজার হাজারো উৎপীড়নে জর্জ্জরিত হয়ে সারা দেশ ফরাসী বিপ্লবের সময় একদিনে কেমন করে জেগে উঠ্‌ল, সে ইতিহাসের এক বিস্ময়কর কাহিনী। সেদিন যে মন্ত্র তাদের মনে বল সঞ্চার করেছিল, তা হ'ল ছোট্ট তিনটি কথা—Liberté, Egalité ও Fraternité—অর্থাৎ স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী। এই বাণী সেদিন তাদের দেশেরই মাত্র অভাব-অভিযোগ ব্যক্ত করে নি, সারা পৃথিবীর, সারা দেশের সকল কালের দাবীর কথাই জানিয়ে দিয়েছিল। তাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তুই ছিল বিশ্বের সকল জাতির এবং সকল শ্রেণীর লোকের কাম্য। প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকারের কথাই তাদের মুখে রূপ নিয়ে সেদিন প্রকাশ হয়েছিল।

এই সম্পর্কে একটি অতি ছোট কথা উল্লেখ করা দরকার। ছোট হলেও তা হতে ফরাসী জাতির জাতিগত উদারতার ও সাম্যপ্রীতির একটি বড় প্রমাণ আমরা পাই। ফরাসী দেশে সকল পুরুষকেই জাতি-ব্যবসা-নির্ব্বিশেষে 'মশিও' অর্থাৎ 'মহাশয়' বলে ডেকে কথা সুরু করতে হয়। রাস্তার ঝাড়ুদার বা মুটেকেও আমরা মশাই বলতে বাধ্য,—

এই হ'ল সে দেশের প্রথা। আমাদের দেশে সেটা কি সম্ভব ?"

তাই বল্‌ছিলাম ফরাসীদের জাতীয় আদর্শ কত মহান, কত উদার।* জার্ম্মানীর আদর্শ প্রচণ্ড দাম্ভিকতায় স্ফীত ; সারা বিশ্বের ত্রাস-স্বরূপ। ইংলণ্ডের আদর্শ কেবল মাত্র 'ইউনিয়ন্ জ্যাকের' স্বার্থ সংরক্ষণেই পর্য্যবসিত, পরের ভাবনা ভাববার আর সময় হয় না। কিন্তু ফরাসীর আদর্শ সকল মানবের ন্যায্য অধিকারের সংরক্ষণ। তা আকাশের মত ব্যাপক, বাতাসের মত উদার, এবং আলোর মত সকলেরই কামনার জিনিষ।

* * *

কেউ যদি প্রশ্ন করেন, যে জগতের কোন্ জাতির মেয়েকে সব থেকে আমার ভাল লাগে, আমি অবশ্য বল্‌ব বাঙালীর মেয়েকে ; কারণ আমি নিজে বাঙালী। আর বাঙালীকে বাদ দিয়ে যদি কেউ এ প্রশ্নের উত্তর চান—তা হলে আমি বল্‌ব, ফরাসী মেয়েদের আমার সব থেকে ভাল লাগে।

ফরাসী মেয়েদের অনেক বদনাম। তারা নাকি দেহের বাহার নিয়েই সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত, ঠোঁটে রুজ তাদের সকল সময়

* Count Keyserling—Europe, "A Spectroscopic View" দ্রষ্টব্য।

লেগেই আছে। ফ্রান্স হ'ল এসেন্সএর দেশ, নানা সুগন্ধ এবং প্রসাধন ক্রিয়ার যত কিছু সরঞ্জাম, তা সব থেকে ভাল তৈরী হয় এইখানেই। পশ্চিম জগতে মেয়েদের ফ্যাসানের নেতা হ'ল ফরাসী মেয়েরা। তারা যে ভাবে চুল ছাঁটবে সারা ইউরোপ—তথা আমেরিকার মেয়েরা—ঠিক সেই ভাবে চুল কাটবে। গাউনের ঝুল হাঁটু অবধি হবে কি পায়ের গোড়ালি অবধি হবে, এটা ঠিক করবার কর্ত্তা এরাই। এই সব নানা কারণে তাদের অপযশ দাঁড়িয়েছে যে তারা ভারি সৌখীন, ভারি হাল্কা প্রাণের জীব।

আমার মনে হয় এই অপযশের কলঙ্ক তাদের ললাটে এঁকে দেওয়া ঠিক হবে না। যাঁরা এরূপ ভাবেন, তাঁরা তাদের ভাল করে চিনে নেবার সুযোগ পান নি। গভীর ভাবে দেখলে তাদের এই অপযশ মুছে দেবার ইচ্ছেটাই হবে বেশী।

বিংশ শতাব্দীর একটি মস্ত বড় আন্দোলন হল নারী জাগরণ। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রমজীবিরা যেমন নিজেদের অধিকার বুঝে নেবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল, তেমনি নারীর অধিকারগুলিকে স্বার্থপর পুরুষের কবল হতে উদ্ধারের জন্য ইউরোপের নারীদের মধ্যেও এক তুমুল আন্দোলন হয়। প্রাচ্যে পুরুষের বহু-বিবাহ-প্রথা প্রচলন থাকায় নারীর অবস্থা একান্তই হীন ছিল। খ্রীষ্টধর্ম্মে এক

কালে পুরুষের বহু-বিবাহের অনুমোদন না থাকায় ইউরোপের নারীদের অবস্থা তত খারাপ ছিল না। কিন্তু অর্থোপার্জ্জন ব্যাপারটি পুরুষের একচেটে থাকায় এবং তাদের স্বাভাবিক স্বার্থপরতা হেতু নারীদের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না।

ন্যায্য অধিকার হতে নারীকে এমন ভাবে বঞ্চিত করে রাখার বিরুদ্ধে বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই সাহিত্যের মধ্যে প্রতিবাদ প্রকাশ পেয়েছিল। * কিন্তু পুরুষের এই স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং যথোচিত প্রতিকারের চেষ্টা ভাল করে আরম্ভ হয় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। এই আন্দোলনের প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন নরওয়ের মেয়ে 'এলেন কেই'। কয়েক বছর হল তিনি মারা গিয়েছেন। তাঁর লেখা পড়ে এবং তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ইউরোপের সকল দেশেই নারীদের মধ্যে জাগরণের সাঁড়া পড়ে যায় এবং এই আন্দোলন ক্রমশঃই বল সঞ্চয় করতে থাকে। পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার লাভই এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য।

এই চেষ্টার ফলে একে একে সকল অধিকার পুরুষের হাত হতে উদ্ধার করবার পর বাকি রইল রাজনৈতিক সাম্যস্থাপন। ইউরোপের কোন দেশে মেয়েদের তখনও ভোট দেবার অধিকার হয় নি। মেয়েরা তাই দাবী করে

---

* Ibsen—'Doll's House' দ্রষ্টব্য।

বস্‌লেন যে তাদেরও ভোটের অধিকার দিতে হবে। এক দল লোক বল্‌লেন, রাজনীতি মেয়েদের জিনিষ নয়, তারা ঘর-সংসার নিয়ে থাকুক। মেয়েরা কিন্তু সে কথা মান্‌লে না। সকল দেশেই এই তীব্র আন্দোলনের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল এবং শেষ কালে হার মেনে মেয়েদেরও ভোটাধিকার দিতে হয়েছে। ইংলণ্ডে এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন সিল্‌ভিয়া প্যাঙ্কহার্ষ্ট। তাঁর নেতৃত্বে নারীরা বক্তৃতা করে, শোভাযাত্রা করে এবং দরকার হলে আঁচড়ে কামড়ে ইংলণ্ডের পুলিশকে রীতিমত বিব্রত করে তুলেছিল। এরই ফলে বিলাতের নারীরা মাত্র সেদিন যুদ্ধের শেষে ভোটাধিকার পায়। সেও ত্রিশ বছর বয়স পার হলে তবে, অথচ পুরুষের একুশ বছর বয়স হলেই ভোটাধিকার জন্মায়। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ হয় এবং তার ফলে গত ১৯২৯ সাল হতে একুশ বছর বয়স্ক নারীকে পর্য্যন্ত ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে।

সারা প্রতীচ্য জগতের বুকের ওপর দিয়ে এই যে তুমুল ঢেউ বয়ে গেল, ফরাসী মেয়েদের মধ্যে কিন্তু তার কোন ঘাত-প্রতিঘাতেরই লক্ষণ কোন দিন দেখা গেল না। না হল সারা দেশের কোথাও একটি সভা, না হল কোন শোভাযাত্রা;—কোন ফরাসী মেয়ের মনেই এ নিয়ে কোন চাঞ্চল্য জাগল না। তারা বল্‌লে ভোটের অধিকার আমাদের থাক্‌লেই বা

কি, না থাক্‌লেই বা কি। রাজনীতিতে আমরা কোন আকর্ষণ পাই না, তা নিয়ে আমাদের লাভ নেই। আমরা চাই সংসারের পূর্ণতম কর্ত্তৃত্ব। সেই কারণে ইউরোপের অন্যান্য দেশে তাদের ভোটাধিকার থাক্‌লেও ফ্রান্সের মত সুসভ্য দেশে মেয়েদের ভোটের অধিকার আজও নেই। দেশে কখন কে মন্ত্রীর পদ গ্রহণ কর্‌বেন, এ নিয়ে সে দেশের মেয়েরা এতটুকু মাথা ঘামায় না।

এ যেন ফরাসী মেয়েদের নিতান্তই কলঙ্কের কথা। যেন আমাদের দেশের অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত—পর্দ্দার আড়ালে মানুষ—মেয়েদেরই ইহা শোভা পায়। আমার কিন্তু মনে হয় এটাই ফরাসী মেয়েদের খুব সম্মানকর বৈশিষ্ট্য। এর পেছনে আছে তাদের হৃদয়ের মহত্ত্বের একটি মস্ত বড় ইঙ্গিত।

পুরুষের লোলুপ দৃষ্টির কবল হতে নারীর স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা যে মহৎ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এতে একদিকে পুরুষকে স্বার্থপরতার কলঙ্ক হতে মুক্ত করা হয়, অন্য দিকে নারীর বল সঞ্চয় করে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ সাধিত হয়। যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য কেবল এই-ই—তার বিরুদ্ধে কারও কিছু বল্‌বার নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়—মেয়েরা অনেক সময় এই আন্দোলনটিকে ঠিক পথে চালিত করতে পারেন নি।

কারণ, বহুকাল পুরুষের অধীনে পঙ্গু হয়ে থেকে থেকে তাদের মনে এই ধারণা জন্মে গেছে, যে পুরুষ হ'ল নারীর চেয়ে উৎকৃষ্টতর জীব। এই মনোভাবকে মনোবিজ্ঞানে আখ্যা দেওয়া হয় 'ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স'। ইহারই প্রভাবে তাদের মনে এই জিদ চেপে আছে যে তারা নানা উপায়ে প্রমাণ করে দেবে—তারা পুরুষের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়।

এর ফলে তাদের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ন্ত্রিত হয় শুধু এই একটি কথা প্রমাণ করিয়ে দিতেই, যে তারা কোন বিষয়ে পুরুষের কাছে ছোট নয়, সব বিষয়েই পুরুষের সমকক্ষ। পুরুষ ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছে, মেয়েও হবে। পুরুষের অষ্ট্রেলিয়ায় যেতে এয়ারোপ্লেনে লেগেছে দশ দিন, 'কুছ পরওয়া নেই', আমাদের এমি জন্‌সন্ যাবে সাত দিনে!

এমন কি এই নিয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে তুমুল তর্ক বেঁধে যায় যে বুদ্ধিবৃত্তিতে মেয়ে বড়—না পুরুষ বড়। নারী এই নিয়ে বই লিখে পুরুষের বুদ্ধিবৃত্তির নিকৃষ্টতা প্রমাণ করে এবং পুরুষ তার উত্তরে বই লেখে মেয়েদের পাল্টা গাল দিয়ে। * পুরুষের মস্তিষ্কের ওজন 'নাকি মেয়েদের মস্তিষ্ক হতে কয়েক আউন্স বেশী। এই তথ্যটিকে প্রমাণ স্বরূপ দাঁড় করিয়ে পুরুষরা গলাবাজি করে এই কথা

* Ludo Vici—'The Defence of Man' দ্রষ্টব্য।

প্রচার করে, যে এর মানে হ'ল—মেয়েরা বুদ্ধিবৃত্তিতে তাদের নিকৃষ্ট। এ দিকে কিন্তু দেহের আয়তনে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে ছোট, এবং সেই অনুপাতে মেয়েদের মস্তিষ্ক পুরুষদের চেয়ে বড় প্রমাণিত হয়। অতএব মেয়েরাও বল্‌তে পারেন যে তুলনায় মেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকৃষ্টতার এটাই প্রমাণ। কিন্তু এই অবান্তর তর্কের কোন অর্থই হয় না; কারণ নারী-পুরুষ উভয়েই মানুষ। মানুষের যতখানি বুদ্ধি থাকা সম্ভব তা উভয়েরই থাক্‌তে পারে।

এই সংঘর্ষের মস্ত বড় দোষ এই যে, এর ফলে মেয়েদের জিদ চেপে যায়—পুরুষকে সকল বিষয়েই তারা হার মানাবে। এমন কি যে বিষয়ে প্রাকৃতিক গঠন হেতু পুরুষ নারী হতে বেশী সুবিধা পায়, সে বিষয়েও মেয়েরা হার মান্‌তে রাজী হবে না এবং বারবার সেই সত্যের খণ্ডনের চেষ্টায় নিজেদের সামর্থ্যের অপব্যয় ঘটাবে। শারীরিক বলে বাস্তবিক পুরুষ নারী হতে অনেক বড়, প্রকৃতি তাকে এমন ভাবেই গড়ে তুলেছে। নারী উচিত—নিজেকে বলবত্তর প্রমাণ কর্‌বার বৃথা চেষ্টা না করে, সেটাকে মেনে নেওয়া। কিন্তু এই ধরণেরই বহু প্রচেষ্টা মেয়েদের উপহাস্যাস্পদ করে তুলেছে। এই নারী অন্দোলনকে অনেকে 'এপিং মুভ্‌মেণ্ট' আখ্যা দিয়েছিল।

শারীরিক বলে নিকৃষ্ট বলেই যে পুরুষের জয়লাভ

সাব্যস্ত হয়ে গেল—এমনও ত নয়! শারীরিক বল মনুষ্যত্ব বিকাশের দিক হতে অতি নগণ্য;—না হলে, মানুষ ঋষির পূজা না করে হাতীর পূজা সুরু করে দিত। শারীরিক বলে মানুষ হতে পৃথিবীতে হাজার হাজার বলবান জীব আছে। এই যদি মাপকাঠি হয় ত জীব-জগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব আর প্রমাণ হতে পারে না। মেয়েরা পুরুষ হতে উৎকৃষ্ট, কি পুরুষরা মেয়েদের চেয়ে উৎকৃষ্ট—এ প্রশ্নের মীমাংসা কেউ কোনদিন করে দিতে পারবেন না। তবে একথা সত্য যে পুরুষ ও নারী পরস্পর বিভিন্ন এবং ঠিক সেই কারণে উভয়ের সার্থকতার পথও বিভিন্ন।

মেয়েরা যতই বাহিরে আসুক না কেন তাদের মন হ'ল ঘরমুখী। নারীর সার্থকতা গৃহলক্ষ্মীরূপে, কল্যাণীরূপে। ঠিক সেই কারণে আমাদের কবি 'সর্ব্বশেষের শ্রেষ্ঠ দানটি' নিবেদন করেছেন এই 'কল্যাণী নারীর' উদ্দেশ্যেই। অনেক নারী বাহিরে আস্‌তে পারেন, রাজনীতিতে বড় হতে পারেন, তাতে বাধা নেই; তবুও একথা সত্য যে সাধারণ নারীর কর্ম্মক্ষেত্র হ'ল গৃহ। সেই কর্ম্ম-ক্ষেত্রের পথে যদি কেউ বাধা দেয়, নারীর কর্ত্তব্য হবে তাকে দূরে ঠেলে, সে চরম অধিকার পূর্ণরূপে আদায় করে নেওয়া। আর কোন বাধায় এমন কিছু আসে যায় না, এবং তাকে উপেক্ষা করাও যেতে পারে।

ফরাসী নারীর কৃতিত্ব এই যে, এই সত্যটিকে তারা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করেছিল। তারা জেনেছিল যে, তাদের গৃহলক্ষ্মী হ'বার পথটি কেউ রোধ করে নি। কাজেই তাদের আর কোন গৌণ অধিকারে তারা বঞ্চিত হ'ল কি না, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার বিশেষ দরকার হয় নি। নারী-চরিত্রের আসল রূপটি তাদের চক্ষে এতই স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছিল; কারণ তাদের মধ্যে নারীত্ব পরিপূর্ণরূপে বিকশিত। গৃহিণী হিসাবে, কল্যাণী হিসাবেই তারা তাদের জীবন নিঃশেষে উৎসর্গ করে দিতে চায়। তাই তাদের কাণে অন্য কোন দাবীর আহ্বান পৌঁছায় নি, এত বড় নারী-আন্দোলনের সময়ও এমন নির্ব্বিকার হয়ে বসে থাক্‌তে পেরেছিল।

এ হতে কেউ যেন এমন ধারণা না করেন, যে ফরাসী মেয়েরা কেবল গৃহিণী হতেই জানে, আর কিছুর খবর তারা রাখে না। সেটা অত্যন্ত ভুল হবে। ঘরকন্নার কথা ছাড়া যে তারা আরও অনেক কথা ভাব্‌তে জানে, ইতিহাসে তার প্রমাণ যথেষ্ট রয়ে গিয়েছে। শুধু যে তারা ভাবে তা নয়, এমন করে ভাবে—যেমন করে পৃথিবীর আর কোন নারী কোন দিন ভাবে নি!

দেশের জন্য প্রাণ বলি দিতে ফরাসী-মেয়ে জোয়ান্‌ই সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীর মেয়েদের শিখিয়েছিল। নগণ্য গ্রামের

এক চাষার ঘরের মেয়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে ফরাসী বাহিনীর নেতা হয়ে শৌর্য্যগুণে সে স্বদেশকে বিজাতীয়ের হাত হতে মুক্ত করেছিল,—এমন উদাহরণ ত পৃথিবীতে আর ছুটি নেই !

ফ্রান্স যেমন এই কর্ম্মবীর নারীর মা, তেমন তাঁর আর একটী গুণবতী মেয়ে জ্ঞানসাধনায় নারীর প্রতিভার চরম প্রমাণ দিয়ে গেছেন। তাঁর এই অপর কন্যাটি হলেন মাদাম কুরী। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নারী যে পুরুষ হতে কোন অংশে কম নয়, তাঁর জীবন সেই কথাটি প্রমাণ করে। আমরা জানি যে 'এক্‌স্‌রে'র সাহায্যে চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেক উন্নতি সাধন হয়েছে। এই বৈদ্যুতিক আলোর আবিষ্কারের পেছনে ছিল এই মহীয়সী নারীর সাধনা। রেডিয়মের যে গুণ তাকে অন্য ধাতু হতে বৈশিষ্ট্য দান করে, সে তথ্যের আবিষ্কর্ত্তা তিনি। জ্ঞানের অনুশীলনের জন্য এরূপ আত্মনিবেদন করেছেন—এমন নারী পৃথিবীতে আর একটিও নেই।

এমন ছুইটি নারী পৃথিবীর আর কোন দেশের ভাগ্যে জোটে নি। যে দেশে 'জোয়ান্' এবং 'কুরী'র মত নারী জন্মেছে, সে দেশ ধন্য, সে দেশ নারী-জগতের বরেণ্য !

চৌদ্দ

আর ভাল লাগ্‌ল না, তাই লণ্ডনে পালিয়ে এলাম। ফ্রান্সে ঘুরে ঘুরে মনে কেমন যেন হাঁপ লেগে ছিল। ভবঘুরে জীবনের হট্টগোল ভাল লাগে না মোটেই

বন্ধুরা বার বার বল্‌ল—ছুটির ত এখ অনেক বাকি, এত শীগ্‌গির ফিরবে? চল যাই সুইট্‌জারল , চল বার্লিন, রোম, ভিয়েনা। আমি বল্‌লাম—চুলোয় দেশ দেখা, ঘুর্‌তে আর ভাল লাগে না।

দেশের জন্য মন কেমন করে। দেড় বছর হতে চল্‌ল দেশের সঙ্গে বিচ্ছেদ। আত্মীয়স্বজন কত হাজার হাজার মাইল দূরে! মনে এক মস্ত বড় কষ্টের বোঝা পাথরের মত চেপে বসে থাকে। এ নিয়ে কি দেশ দেখা চলে? দেশ দেখতে যে হাল্কা মন চাই, সে হাল্কা মন ত আমার নেই!

ঘরমুখী মন আমার বসে থাকে সেই দিনের দিকে চেয়ে—যখন দেশে ফের্‌বার দিন নিকটে আস্‌বে। তার আগে যত মাস আছে, বছর আছে,—ইচ্ছে করে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিই। 'রিপ্‌ভ্যান্‌ উইঙ্কল্‌'এর মত কেউ যদি আমায় এমন ঘুম পাড়িয়ে দেয়, যে সে ঘুম ভাঙ্‌বে ঠিক দেশে ফের্‌বার আগের দিনে, তা হলে তার কাছে আমি কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাতাম ভেবে পাই না। সে ত আর সম্ভব নয়; কাজেই কোন রকমে লণ্ডন সহরের এক কোণে বসে দিনগুলো কাটিয়ে দেবার চেষ্টা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

লণ্ডন সহর, সেই পুরানো লণ্ডন সহর। এ যেন এখন আমার নিজেরই সহর হয়ে গিয়েছে। পথে যখন চলি, রাস্তা-গুলো বেশ চেনা লাগে। বাড়ী ও পার্কগুলি চিন্‌তে পারি, মানুষগুলো যে কথা বলে, তা বেশ বুঝতে পারি; মনটা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

পরিচিতের প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। অপরিচিতকে নূতনত্বের খাতিরে দু-পাঁচ দিন ভাল লাগতে পারে, কিন্তু চিরকাল অপরিচিতের মধ্যে থাক্‌তে গেলে মানুষ পাগল হয়ে যেত। শান্তি, নিশ্চিন্ততা—এ সমস্ত সম্ভব হয় পরিচিতের কাছে। অপরিচিত কেবল আমাদের ব্যতিব্যস্তই করে। আমার মা আমার কাছে এত প্রিয়, তার কারণ তাঁর সঙ্গে পরিচয় আমার সর্ব্ব-

প্রথম। আমার দেশকে আমার এত ভাল লাগে—তার কারণ, দেশের সঙ্গে পরিচয়ের আরম্ভ আমার ছোটবেলা হতেই। প্যারিতে আমার নিজেকে কেমন বিদেশী বিদেশী ঠেকে। লণ্ডন কিন্তু হয়ে গেছে যেন আত্মীয়ারই মত। এই ব্যথাতুর মন নিয়ে অনাত্মীয় ভূমিতে ঘুরতে তাই মন যেন চায় না। লণ্ডনে চুপ করে একা একা বসে থাকতেও ভাল লাগে।

যে বাড়ীতে থাকি, সে বাড়ীতে আমি এখন একেবারে একা। আর যে সব ভারতীয় ছাত্র থাকত, তারা সব সুদীর্ঘ ছুটি পেয়ে বেড়াতে বেরিয়ে গেছে নানা দিকে। কলেজ খুলবার এখনও দেরী আছে; সময় হলে তারা ফিরবে। এতে বিদেশ বাসের নির্জ্জনতা আরও গভীর হয়ে যেন বুকের ওপর চাপে। আগে কলেজ ছিল, দু'চার জন সঙ্গী ছিল বাড়ীতে, এখন কেউ নেই।

জানালার ধারে একটা চেয়ারে বসে বসে আমার সময় কাটে। জানালার পাশেই অনেকখানি বাগান, সে বাগানে বহু গাছ আছে। বাগানের ওপরে কিছু দূরে এক সার বাড়ী, তাদের মাথার ওপরে চিমনিগুলো যেন আকাশের বুকে বিঁধে রয়েছে।

এই সুদীর্ঘ দেড় বছরের মধ্যে জানালার বাইরে যে ক্ষুদ্র একখণ্ড জগত পড়ে রয়েছে, তার প্রতি কতবার চেয়েছি। দুঃখের আতিশয্যে কতবার ওই গাছগুলোর কাছ হতে

সান্ত্বনা মেগেছি। ওই যে আকাশের একটুখানি অংশ চোখে পড়ে, তার পানে চেয়েছি। তারা হল আমার সাথীবিহীন একক জীবনের সঙ্গী, দুঃখের দিনের দরদী বন্ধু!

আজ দেখি ওই গাছগুলোর সবুজ পাতার গায়ে হলদের আভা নেমেছে, নীল আকাশের গাখানা হয়ে গেছে ঘোলাটে। হেমন্ত আজ প্রকৃতির গায়ে তার বিজয় অভিযানের চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। সূর্য্য এখন অনেক দক্ষিণে সরে গেছে। কি যেন একটা ভয়ঙ্কর কিছু আস্‌ছে, সারা প্রকৃতির রাজ্যে তাই একটা ত্রাসের সাড়া পড়ে গিয়েছে।

মনে পড়ে, এই বাড়ীতে এই ঘরে প্রথম এসে এই জানালার পানে প্রথম যখন চেয়েছিলাম, তখন ওই গাছ-গুলোর পোষাকের রঙ্‌টি ছিল নিখুঁত সবুজ। তখন আকাশের রঙ্‌টি ছিল স্বচ্ছ নীল এবং সূর্য্য ছিল সতেজ।

দিনের পর দিন কেটেছে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ গিয়েছে, মাসের পর মাস এসেছে। অধীর প্রতীক্ষায় একে একে আমার দিন কেটেছে। আমার চোখের সামনেই এই গাছের সবুজ রঙ্‌ মলিন হয়ে ক্রমশঃ কটা হয়েছে। তারপর ঝড় এসেছে, গাছের সব পাতা খসে গিয়ে গাছগুলি একান্ত দীন বেশে আবরণ হীন দেহে আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়েছে। তারপর এসেছে শীত, কঠোর নির্ম্মম শীত। এই গাছগুলোকে ব্যঙ্গ করেই যেন শীত তার তুষারের প্রলেপ দিয়ে সাজিয়েছে।

সে দুর্দ্দিনও গেল, এল বসন্ত,—চারি দিকে প্রাণের সাড়া পড়ে গেল। এই মরা-কাঠের মত গাছগুলোর দেহও নবীন কিশলয়ে ছেয়ে গেল। সারা প্রকৃতির আবার দেখা দিল পরিপূর্ণ যৌবনা ষোড়শীর রূপ। সেদিনও গেল; আজ তার যৌবন আবার হেমন্তের পরুষ-স্পর্শে ম্লান হতে চলেছে।

নটরাজের নৃত্যের তালে তালে প্রকৃতির বুকে যে নব নব ঢেউ বয়ে যায়, তার খবর এই বৃক্ষ-শোভিত ভূখণ্ডখানিই আমার নির্জ্জন জীবনে পৌঁছে দিয়ে গেছে।

বছর ঘুরে নূতন বছর এসে গিয়েছে, গাছের পাতার ঘন সবুজ রঙ্ আবার যেন ম্লান হতে চলেছে। গ্রীষ্মের অকলঙ্ক দেহে আজ হেমন্তের ছায়াপাত হয়েছে। তার ইঙ্গিত হ'ল এই যে—সাম্‌নে শীত, ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাড়-জ্বালান শীত আস্‌ছে। আর সঙ্গে আস্‌ছে ঘন কুয়াশা আর মেঘে ঢাকা অন্ধকার দিনগুলো, কোন রকমে ঘরের কোণে বসে লেপ জড়িয়ে কাটিয়ে দেবার দিন। সারা প্রকৃতির মুখে যেন কালিমা ফুটে উঠেছে। এ দিনগুলো মনে আশা জাগাতে জানে না, জানে আশা ভাঙ্‌তে।

আমার সুমুখের দিনগুলোও যেন সেই রকম আশাহীন অন্ধকারে ভরা। দেশে ফের্‌বার সময় আস্‌বার পথে যে দিন ও মাসগুলো হিমালয়ের মত পথ আট্‌কে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেগুলোকে ঠেলে সরিয়ে দেবার যেন কোন

উপায়ই নেই। এখনও কত দিন, কত মাস! তারা আমার জন্য সঞ্চয় করে রেখেছে—অনন্ত কষ্ট আর অনন্ত অধীরতা।

দিগভ্রান্ত নাবিক যখন সমুদ্রের ওপর দিনের পর দিন চলেও কূলের সন্ধান পায় না, তখন সে অধীর হয়ে বলে ওঠে, 'আর কত দূর!' পথহারা পাখী যখন দিনশেষে ঘরমুখী হয়ে উড়ে উড়ে থৈ পায় না, তার দেহ তখন অবশ হয়ে আসে, পাখা যেন আর চল্‌তে চায় না। সেই নাবিকের অধীরতা আর সেই পাখীর ক্লান্তি আজকে আমার নিজের অনুভূতি দিয়ে বেশ হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পারি।

স্বদেশ যে মানুষের কত প্রিয়, আজ নিজের দুঃখ দিয়ে তা বেশ অনুভব কর্‌ছি। আমার আত্মীয়-ভূমি, যেখানে আমার মায়ের কোলে আমার জন্ম, যেখানে আমার ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে আমার পরিচয়, তার স্পর্শ হতে বঞ্চিত হ'য়ে তাকে যেন আজ আরও বড় করে পেয়েছি। অনাত্মীয় ভূমির মধ্যে তার জন্য আমার ব্যাকুলতা শত গুণ —সহস্র গুণ বর্দ্ধিত হয়েছে। সে দেশ অতি পরিচিত, আমার প্রিয়তম। পরের দেশ ত অনেক দেখেছি, দেখে দেখে মন অধীর হয়ে উঠেছে। প্যারি হতে লণ্ডনে পালিয়ে এলাম, তাতেও ত তৃপ্তি পেলাম না। তৃপ্তি পেতাম যদি আজ সোজা দেশে চলে যেতে পার্‌তাম। কিন্তু সাম্‌নে এই দিনগুলো!

মায়ের সঙ্গে ছেলের মিলনে কে যেন নিষ্ঠুর এক অপরিসীম বাধা সৃষ্টি করছে।

ওই সূর্য্য মুখখানা রাঙা করে চিমনিগুলোর ওপাশে চলে গেল। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে প্রকৃতির মুখখানি দেখাচ্ছে আরও মলিন! তার মনের মধ্যে যে অত্যন্ত বেদনার আলোড়ন চলেছে তা যেন আমারই মত গভীর। এ দুঃখের মোচন হবে কবে?—জানালার ধারে বসে বসে প্রকৃতির মলিন মুখ পানে চাই আর ভাবি, ভাবি আর চাই!

পনেরো

লণ্ডনের আকাশে আজকাল ঘন ঘন এয়ারোপ্লেনের সারি উড়্‌তে দেখা যায়,—কারণ, ব্রিটিশ সৈন্যরা আজকাল যুদ্ধ শিক্ষা কর্‌ছে। আর ছ্‌দিন বাদেই হেনডনে 'এয়ার শো' হবে :—দেখান হবে সৈন্যরা এয়ারোপ্লেনে চড়ে যুদ্ধ কর্‌বার কত রকম কারসাজি শিখেছে। ওদিকে দক্ষিণ-ইংলণ্ডে স্থলযুদ্ধ অভ্যাস হচ্ছে এবং সাদ্দাম্‌টন্‌ বন্দরে চলেছে নৌ-যুদ্ধ-চর্চ্চা। ইংলণ্ডে প্রতি বছর এই রকম সব বিভাগের সৈন্যদের যুদ্ধচর্চ্চার সুযোগ দেবার জন্য বিরাট আয়োজন হয় এবং কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হয়। শুধু ইংলণ্ড কেন, জগতের সব ক'টা বড় জাতিই পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এই রকম যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র বৃদ্ধি এবং কলাকৌশল শিক্ষার ব্যবস্থা কর্‌তে সুরু করেছে।

বছরের পর বছর ধরে সারা পৃথিবী জুড়ে এই বিরাট অপব্যয় চলেছে। এটা যে অন্যায়, সে উপলব্ধি অনেকেই করেছেন। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের মনীষী বার্‌ট্‌রাণ্ড রাসেল এই যুদ্ধ অভিযানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। * সেই কারণে কিছুদিন তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ কর্‌তেও হয়েছিল।

যে জ্ঞান-সাধনা মনুষ্যত্ব ফুটিয়ে তোলে এবং সকল বিষয়ে তার সমৃদ্ধি সাধন করে, তাহাই আবার নিয়োজিত হয় মানুষকে মার্‌বার প্রকৃষ্টতম উপায় উদ্ভাবন কর্‌তে। যে শক্তি মানুষের স্বোপার্জ্জিত এবং করায়ত্ত এবং যে শক্তি মানুষের অশেষবিধ কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত হতে পার্‌ত—সেই শক্তিরই নিয়োগ হয় নর-হত্যায়। এ যেন অলঙ্ঘ্য নিয়তির বশে নিজের ঘোরতম অকল্যাণ হবে জেনেও তারই পানে ছুটে যাওয়া। এমন অদ্ভুত বিকারগ্রস্ত দৃশ্য বোধ হয় জগতের আর কোথাও দেখা যায় না।

সেদিন রেমার্কের বই পড়ে সারা জগত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। † তাতে যুদ্ধের নির্ম্মম কঠোরতা এবং ঐকান্তিক বীভৎসতার ছবি সুন্দর ফুটে উঠেছে। আর ফুটে

* Bertrand Russel—'Why Men Fight?' দ্রষ্টব্য।

† Erich Maria Remarque—'All Quiet on the Western Front.'

উঠেছে কিশোর হৃদয়ের ওপর যুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাতের সুনিবিড় নিপীড়নের ছবি। সেই বর্ণনা দরদ দিয়ে লেখা এবং অভিজ্ঞতার আলোয় দীপান্বিত। তবু যেন মনে হয় যুদ্ধের কুফলের পরিপূর্ণ ছবি তাতে মেলে না, তার বীভৎসতার নগ্নতম রূপটি আমাদের চোখের সাম্‌নে আসে নি; যুদ্ধের অনাসৃষ্টির ব্যাপকতা আরও অনেক বেশী।

অনেকে যুদ্ধ করতেই ভালবাসে; এমন কি অনেকে আবার যুদ্ধকে মানুষের উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বলেই মনে করে। যখন দেশের ষ্টেট্ বা শাসনযন্ত্র তার সুবিপুল শক্তির ভয় দেখিয়ে কোন ব্যক্তি-বিশেষকে বলে —'তোমার ওই দেশের লোকগুলোকে মারতে হবে, কারণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে', তখন যে যুদ্ধ ভালবাসে সে বল্‌বে 'এত বেশ ভাল কথা'। যার ধারণা এই যে যুদ্ধ না কর্‌লে মানুষের চরিত্রের অবনতি ঘট্‌বে, সে শাসনযন্ত্রের এ হুকুমকে অনুমোদনই কর্‌বে।

কিন্তু এমন লোকও যথেষ্ট আছে যাদের যুদ্ধের প্রতি আদৌ সহানুভূতি নেই, যুদ্ধ করবার উৎসাহ ত নেই-ই। ফরাসী চাষা, সে থাকে গ্রামের কোণে; চাষ করে আর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে তার জীবনযাত্রা সুখে নির্ব্বাহিত হয়। জগতের কোন জাতির ওপর তার রাগ নেই বা বিদ্বেষ নেই। ব্যক্তিগত ভাবে জার্ম্মান চাষার প্রতি তার বিদ্বেষ না থেকে

মমতা থাকাই বেশী স্বাভাবিক। তবু দুই দেশের শাসনযন্ত্র যখন ঠিক করে বসে যে পরস্পর দুই জাতিতে যুদ্ধ হবে,—তখন তাদের সে বিধানের প্রতিবাদ করবার কোন উপায়ই থাকে না।

পাষাণের মত কঠোর এবং দৈত্যের মত বলবান সে বিরাট শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত শক্তি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তিবিশেষ কোথায় পাবে? তাই একান্ত নিরুপায় হয়ে ফ্রান্সের চাষা যুদ্ধক্ষেত্রে ছোটে বন্দুক ঘাড়ে করে; তার জার্ম্মান চাষা-ভাইকে সে মারতে যায়। অথচ তার প্রতি কোন রাগ নেই, কোন বিদ্বেষ নেই, আছে বরং হৃদয়ভরা ভালবাসা। যুদ্ধে যেতে বিমুখ হলে শাসনযন্ত্রের হুকুম হবে—তাকে গুলি করে মারবার। যুদ্ধ না করলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, যুদ্ধ করলে হয়ত ভাগ্যের জোরে সে প্রাণ নিয়ে ফিরতেও পারে। তাই যুদ্ধে যাওয়াই সে তুলনায় শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে।

ফরাসী সাহিত্যিক বই লিখতে ব্যস্ত। সে তার নিজের সৃষ্ট ক্ষুদ্র জগত ছাড়া বাহিরের আর কোন কিছুরই ধার ধারে না। যুদ্ধ করবার তার এতটুকু স্পৃহা নেই, তবু তাকে যুদ্ধে যেতে হবে। ওদিকে জার্ম্মান চিত্রশিল্পী ছবি আঁকা নিয়ে ব্যস্ত, প্রচ্ছদপটের সীমার মধ্যেই তাঁর সমস্ত মনখানি নিবিষ্ট। যুদ্ধে তারও যোগদান করতে হবে। বিরাট শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে মাথা তোলবার সাধ্য কারও

নেই। সে বিধাতার বিধানেরই ন্যায় অলঙ্ঘনীয়। ফলে কত শত শিল্পী, কত শত বৈজ্ঞানিক, কত শত সাহিত্যিক তাদের সাধনা, তাদের দান দিয়ে মানব সভ্যতাকে শ্রীমণ্ডিত করবার বাসনা ও সুযোগ হারায়! সভ্যতার দিক হতেও কি মানুষ কম হারায়! গত ইউরোপীয় মহাসমরের ফলে এমন ভাবে কত রিউপার্ট ব্রুক্ মারা গিয়াছেন, কত রাফায়েল-দাবিঞ্চি অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছেন, কত রবীন্দ্রনাথ-আইনষ্টাইনএর দান হতে মানবসভ্যতা বঞ্চিত হয়েছে!

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ওপর শাসনযন্ত্রের এমন পরুষ হস্তক্ষেপ কেন যে মানুষ সহ্য করে বুঝ্তে হলে রাজনীতির কয়েকটা মৌলিক তথ্যের অবতারণা কর্তে হয়। হবস্এর ধারণা এই,—প্রত্যেক মানুষের স্বভাব এমনি উগ্র যে ওপরে যদি কোন শাসকের ভয় না থাক্ত, তা হলে নাকি মানুষ নেক্ড়ে বাঘের মত পরস্পরকে টুক্রো টুক্রো করে ছিঁড়ে ফেল্ত। একথাটা একটু অতিরঞ্জিত হ'লেও অনেকখানি সত্য। যখন মানুষ বাস করত গুহায় গুহায় আলাদা হয়ে, একেবারে বিচ্ছিন্ন ভাবে, সেই আদিম যুগে এমন কোন ব্যাপার ঘট্বার সম্ভাবনা ছিল না। তারপর মানুষ নিজেরই সুবিধার জন্য যখন দল বেঁধে বাস কর্তে সুরু কর্ল, তখনই একটা শাসন-যন্ত্র ধরণের কিছু দরকার হয়ে পড়্ল। বহু মানুষের মধ্যে পরস্পরের শান্তি সংরক্ষণের জন্যই এই

শাসনযন্ত্রের প্রয়োজন। তখন শাসনকার্য্যের ভার ন্যস্ত হয়ে পড়ল দলপতির ওপর। তারপর মানুষ কৃষিজীবি হয়ে উপনিবেশ স্থাপন করল, দশটা দল নিয়ে একটা বৃহত্তর সমষ্টির সৃষ্টি হ'ল এবং ক্রমে শাসনকার্য্যের ভার ন্যস্ত হ'ল রাজার ওপর। এখন রাজনৈতিক সমষ্টির ব্যাপকতা আরও বেড়ে গিয়েছে, দুটো বা দশটা দেশ নিয়ে এক-একটা রাজ্য বা সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে, আর পূর্ব্বাপেক্ষা শাসনযন্ত্রের রূপ কতই না জটিলতর হয়ে দাঁড়িয়েছে!

এখনকার শাসনযন্ত্রের কাজ হ'ল সমষ্টির বা সমগ্র জাতির সাধারণ কল্যাণ সাধন। ভূতপূর্ব্ব শাসনযন্ত্রের চেয়ে শক্তিশালী হওয়ায় তার কার্য্যাবলীও অনেক বেড়ে গিয়েছে। সে সকল কথার বিশদ আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। শাসনযন্ত্রের মুখ্য কার্য্য নিয়েই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে।

মুখ্য কার্য্য দুইটি—এক হ'ল আন্তর্দেশিক শান্তিরক্ষা ও শান্তিসংস্থাপন, এবং দুই হ'ল বাহিরের শত্রুর হাত হতে দেশ রক্ষা। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অধিকার যাতে সুরক্ষিত হয় সেই হ'ল শাসকের প্রধান লক্ষ্য। সেটা রক্ষা হয় বিচারালয় ও পুলিশের সাহায্যে। আজকাল ব্যক্তিগত অধিকার যে খুবই সুচারু-রূপে রক্ষিত হয়, সে কথা সকলেই মানবেন, এবং সেইটাই হ'ল শাসনযন্ত্রের সব চেয়ে গৌরবের বিষয়।

বিদেশী শক্রর দেশ আক্রমণের সম্ভাবনা আজকাল পূর্ব্বতন যুগ অপেক্ষা অনেক বেশী। আগে মানুষের জ্ঞান ছিল অল্প এবং ক্ষমতাও সেই কারণে ছিল অনেক সীমাবদ্ধ। সমুদ্র, পর্ব্বত প্রভৃতি প্রাকৃতিক বাধা তখন এক দেশকে অন্যদেশ হতে বিচ্ছিন্ন করে রাখ্‌ত এবং তাই বহিঃশক্রর আক্রমণের সম্ভাবনাও ছিল কম। মেক্সিকোর ইঙ্কা তখন স্বপ্নেও ভাব্‌তে পার্‌ত না, যে অত বড় আট্‌লান্টিক মহাসাগর পার হয়ে স্পেনের লোকেরা কোনদিন তাদের ঘাড়ে চাপ্‌তে পার্‌বে। আফ্রিকার জংলী কাফ্রিরাও আশঙ্কা কর্‌ত না যে কেউ তাদের নিয়ে ক্রীতদাস কর্‌বে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের ক্ষমতা অসীম। সমুদ্র তাকে বাধা না দিয়ে এক দেশ হতে অন্য দেশে যাতায়াতের সাহায্যই করে, পাহাড়ও আর এখন অলঙ্ঘ্য নয়। কাজেই সারা পৃথিবীর যে কোন অংশ হতেই আজ শক্রর আগমনের আশঙ্কা আছে। অত বড় প্রশান্ত মহাসাগর ব্যবধান থাক্‌লেও আমেরিকার সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ আর তিল মাত্র অসম্ভব নয়, বরং বড় বড় রাজনীতিজ্ঞরা অনুক্ষণ সেই সংঘর্ষের স্বপ্নই দেখ্‌ছেন।

পূর্ব্বে পৃথিবীতে রাজ্যের সংখ্যা ছিল যেমন অল্প এবং পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন, বহিঃশক্রর আক্রমণের কোন আশঙ্কাই তেমনি ছিল না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই

রাজ্যগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে আর সেই সঙ্গে বেড়েছে পরস্পর হতে পরস্পরের আক্রমণের আশঙ্কা।

সাধারণ মানুষ এমনি নীচ যে তার স্বভাবই হ'ল—অন্যের স্বার্থহানি করে নিজের স্বার্থ সাধন করা। এই নীচ প্রবৃত্তি হতে শাসনযন্ত্রের শাসন এবং ভয় পরস্পরকে রক্ষা করে। সঙ্ঘবদ্ধ হলে মানুষের এই প্রবৃত্তিটিও ঠিক সঙ্ঘবদ্ধ আকারেই দেখা দেয়। তখন চেষ্টা হয় অন্য সঙ্ঘের সর্ব্বনাশ করে নিজ সঙ্ঘের উন্নতি সাধন করা। অমুক দলের এক শ' গরু আছে, তাদের মেরে কেড়ে নাও,—এই হ'ল দলবদ্ধ হবার পর মানুষের প্রথম শিক্ষা। রাজার অধীনে রাজ্য গড়ে উঠল, তখন প্রতি রাজার চেষ্টা হ'ল—অন্য রাজাকে পরাজিত করে ধনঐশ্বর্য্য সব কেড়ে নেওয়া। রাজ্যের আয়তন আজ আরও বড়, তার সামর্থ্যও বেশী। সুতরাং তাদের অন্য রাজ্যের ঘাঁড় ভাঙ্বার প্রবৃত্তি আরও উগ্র।

নিম্ন শ্রেণীর জীবজন্তু থাকে জোড়ায় জোড়ায়, কেউ থাকে দলে দলে। তাদের পরস্পর স্বজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে বড় একটা দেখা যায় না, কিন্তু মানুষ তাতেই সিদ্ধহস্ত। বোধ হয় সেটাই তার উচ্চতার প্রমাণ!

কারও যখন অপরের ক্ষতি করবার বাসনা হয়, সে দেখে যে তার ওপর শাসনযন্ত্র চোখ রাঙিয়ে চেয়ে আছে। তাতেই

সে নিরস্ত হয় ; নতুবা তার বিচার হয় এবং দোষ প্রমাণিত হ'লে শাস্তি ভোগও হয়।

একটা দেশ অন্য দেশের প্রতি লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তাকে চোখ রাঙাবার কেউ নেই। সে দেশ যদি তুলনায় বেশী শক্তিশালী হয়, তাহ'লে অন্য দেশটির ত উপায়ও নেই ; লোলুপ দৃষ্টি দিয়েই সে ক্ষান্ত হবে না, আক্রমণ করে ধ্বংস করবে।

এই আন্তর্জাতিক অত্যাচার নিবারণ কেবল মাত্র এক উপায়ে সম্ভব। যদি পৃথিবীর সকল কিম্বা কেবল সেরা জাতি ক'টি মিলে একটি আন্তর্জাতিক কলহ মীমাংসার কোন আদালত সৃষ্টি করেন এবং তাহার মীমাংসাই চূড়ান্ত বলে ধার্য্য হয়, তবে এ সমস্যা একেবারে চুকে যায়।

গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের শেষে আমেরিকার তখনকার প্রেসিডেণ্ট উইলসন্ তাঁর ''লীগ্ অব নেসন্স্'এর পরিকল্পনায় এমনি একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার সঙ্কল্প করেছিলেন। তখন সমস্ত পৃথিবীর সব কটা বড় শক্তি মহাসমরের হাত হতে সবে মাত্র নিষ্কৃতি পেয়েছে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর মহাসমরের ব্যর্থতা এবং অপরিসীম বীভৎসতা গভীর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করবার সময় ছিল তখনই। সময় শুভ হলেও কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

যে জাতির তিনি প্রতিনিধি, সেই মার্কিন জাতিই তাঁকে

দিয়েছিল এ প্রচেষ্টায় সব চেয়ে বেশী বাধা। তারা বলে বস্‌ল—"আমরা ত আটলান্টিক মহাসাগরের পারে একা একা বেশ আছি। ইউরোপে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার কি দরকার? ও সব লীগ্-টীগের আমরা ধার ধারি না।" তখন তারা সমগ্র পৃথিবীর স্বার্থ অপেক্ষা বড় করে দেখেছিল নিজেদের স্বার্থকেই।

এজন্য তাদের খুব দোষ দেওয়াও যায় না: দোষ যুগধর্ম্মের। 'লীগ্ অব নেসন্‌স্' জেনিভাতে একটা নামে মাত্র খাড়া করা হয়েছে। যে সব জাতির নাম তার পৃষ্ঠপোষক বলে লেখা আছে, তারা আসলে কেউই তার পৃষ্ঠপোষক নয়। যে কোন একটা বড় শক্তির সঙ্গে লীগের সংঘর্ষ হলেই, সে তার শাসন অমান্য করবে। লীগের কোন সৈন্যবল নেই, কাজেই তাকে না মান্‌লে তার কিছু কর্‌বারও উপায় নেই। কয়েকটি সৎকথা বলা ছাড়া, তাদের কাজে পরিণত করবার মত কোন শক্তিই তার নেই। এই ত সেদিনই শক্তিমদে মত্ত জাপান মাঞ্চুরিয়ায় গিয়ে গোল বাঁধিয়েছিল। লীগ বল্‌লে—ওটা কর্‌লে চীনের প্রতি বিশেষ অবিচার করা হবে। পরের দিনই শোনা গেল জাপান লীগের সভ্যপদ পরিত্যাগ করেছে। আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ বিষয়ে এখনও 'জোর যার মুলুক তার' এই নীচ নীতি-বাক্যেরই রাজত্ব রয়ে গিয়েছে।

ইহার কারণ বুঝিতে হইলে যুগধর্ম্মের কথাটাই একটু বিশদ আলোচনা করা দরকার।

ঐতিহাসিকরা বলেন যে উনবিংশ শতাব্দীটি হ'ল জাতীয়তা-বোধের প্রতিষ্ঠার যুগ। পূর্ব্বে রাজনীতির জগতে সব থেকে বড় কথা ছিল—রাজভক্তি। তখন দেশাত্মবোধ বা স্বদেশপ্রীতি মানুষের হৃদয়ে জাগে নি এবং সেই কারণে এই কথাগুলিও তখন তৈরী হয় নি। রাজার প্রতি ভক্তি এবং তাঁহার কল্যাণ কামনা ও চেষ্টা—এই ছিল তখন সঙ্ঘবদ্ধ মানবের উদ্দেশ্য ও আদর্শ।

উনবিংশ শতাব্দীতে রুশো এবং দিদেরো প্রভৃতি মনীষী যে নূতন ভাবগুলি মানবসমাজে অনুপ্রবেশ করালেন, তার ফলে রাজার প্রতি ভক্তি ক্রমশঃ শিথিল হয়ে গেল এবং সঙ্ঘবদ্ধ মানবের কামনা ও প্রেরণার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল রাজভক্তির পরিবর্ত্তে দেশভক্তি। যে দেশে কোন এক জাতি নানা যোগসূত্র অবলম্বন করে মিলিত হ'ল, সে জাতি তখন তাদের সম্মিলিত জাতির কল্যাণ কামনাতেই মন দিল। এজন্য দেশকেই দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করে তার পূজার প্রবর্ত্তন হ'ল। দেশের মঙ্গল কামনাই প্রত্যেকের চিন্তার বিষয়; দেশের মঙ্গলের জন্য, দেশের সম্মানের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে শিক্ষা দেওয়া হ'ল। কত কবি দেশের যশোগাথা কবিতায় লিখলেন, কত গায়ক দেশের

গরিমা গাইলেন। স্বদেশ ভক্তি এবং স্বদেশের কল্যাণ কামনা—এই হ'য়ে দাঁড়াল রাজনীতির ক্ষেত্রে সব থেকে বড় লক্ষ্য।

এ পর্য্যন্তও সব ভাল। এখানে থাম্‌লে কোন ক্ষতি ছিল না। কেবল নিজেকে ভালবাস এবং নিজের কল্যাণ কামনা কর—এই শিক্ষার আনুসঙ্গিক কুফল হয় এই, যে এক জাতি অন্য জাতিকে ভালবাস্‌তে ভুলে যায়। কেবল নিজের কল্যাণ কামনা করে করে সে ভাবে—ছলে বলে কৌশলে অন্য জাতির সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত করে নিজের কল্যাণ সাধন কর্‌তে হবে।

মানুষের ধর্ম্ম হ'ল এই যে সে নিজেকে ভালবেসে তার পরমার্থ লাভ কর্‌তে পারে না। তার বৈশিষ্ট্যই হ'ল —সে পরকে ভালবেসে তৃপ্তি পায়। যে মানুষ কেবল নিজের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই খোঁজে, তাকে নীতিশাস্ত্রের পরিভাষায় বলা হয় ইগোয়িষ্ট; আর যে পরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখে, তাকে বলা হয় আলট্রুয়িষ্ট। অর্থাৎ প্রথম দল হ'ল স্বার্থান্বেষী এবং দ্বিতীয় দল পরার্থান্বেষী। একবারেই ষোল আনা স্বার্থান্বেষী মানুষ বড় একটা পাওয়া যায় না। নিছক স্বার্থান্বেষী হ'ল নীচ জাতীয় জীবেরা—নিজের আহার, নিদ্রা ও সুখ অন্বেষণ, এই ক'টি মাত্র জিনিষ নিয়েই তাদের জীবনের কাজ। কিন্তু জগতে এমন মানুষ খুব

কমই আছে যে অন্ততঃ নিজের পত্নী, সন্তান বা মায়ের কল্যাণ চায় না। তাই বল্‌ছিলাম মানুষের স্বভাবই হ'ল পরকে ভালবাসা। যখন আমরা কাউকে ভালবাসি, তখন আমরা তারই সুখ চাই। যাকে ভাল না বাসে মানুষ, তারই অকল্যাণ চায় এবং দুঃখে আনন্দ পায়। যে যত বেশী লোককে ভালবাসে তার পরার্থপরতা তত ব্যাপক। ভালবাসার পাত্রের সংখ্যা বাড়িয়ে চলাতেই মানুষের পূর্ণতার পথ সুগম হয়। যে যত বেশী লোককে ভালবাসে, তার হৃদয় তত উন্নত এবং তার মনুষ্যত্ব তত বেশী বিকশিত।

কাহাকেও যদি শুধু স্বার্থরক্ষণই শিক্ষা দেওয়া যায়, আর কারও সুখস্বাচ্ছন্দ্য সে না দেখে, তা' হলে মনুষ্যত্বের আসন হতে তাকে স্খলিত করানই হয়। নিজেকে ভালবাসা কিছুই অন্যায় নয়, কিন্তু তারপরে পরকেও ভালবাসা চাই। নিজেকে ভালবাসা ও সকলকে ভালবাসার যেখানে সমন্বয়—সেখানেই মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। কেবল নিজকেই ভালবাস,—অর্থ দাঁড়ায় অন্যকে ঘৃণা কর, শত্রু জ্ঞান কর, তাদের সর্ব্বনাশ করে নিজের মঙ্গল সাধন কর। কেবল নিজের স্বার্থ অন্বেষণ কর্‌লে কোন মানুষই সত্যকার সুখ পায় না। এরূপ শিক্ষা যে নীচ এবং সাধারণ নীতি-বিরুদ্ধ, সকলেই তা একবাক্যে স্বীকার করেন।

দুঃখের কথা এই যে ব্যক্তিগত জীবনে যেটা এত

সহজেই নীতিবিরুদ্ধ ঠেকে, সঙ্ঘবদ্ধ জীবনে সেটা মোটেই তা ঠেকে না। এমনই কালের প্রভাব! স্বদেশ-প্রীতি মানে এই দাঁড়িয়েছে যে কেবল নিজের দেশকেই ভালবাস, অন্যের দেশকে ঘৃণা কর এবং তাদের ক্ষতি করে নিজের দেশকে সমৃদ্ধিমণ্ডিত কর। জাতীয়তা-বোধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজার আহুতির প্রধান উপকরণ হ'ল অপর দেশের রক্ত। এই বীভৎস দেবতার উপাসনা নিয়েই আজ পৃথিবীর প্রায় সকল জাতি মত্ত। তাতে মানব-সভ্যতা যে কতখানি পিছিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে কারও দৃষ্টি নেই। বরং ঐতিহাসিক তাকেই অতি সুন্দর জিনিষ বলে প্রচার করছেন এবং কবি তাঁর কবিতায় তারই জয়গান গাইছেন।

চোর-ডাকাত বোধ হয় অন্যকে ভালবাসে না; যদি বাস্‌ত তা হলে অন্যের সর্ব্বনাশ করে নিজের পুষ্টিসাধন কর্‌বার চেষ্টা করত না। স্বদেশপ্রেম মন্ত্র আজ সমগ্র জাতিকেই এই চুরি ও ডাকাতি কর্‌তে শিক্ষা দেয়। দু-দশ জন চোর-ডাকাত হ'লে সমগ্র মানব-সমাজের ততখানি ক্ষতি হয় না, কিন্তু যখন জাতকে-জাত এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়, তখন সমস্ত জগত জুড়ে হয় হিংসা-দ্বেষের বিস্তার এবং গত মহাযুদ্ধের মত বীভৎস নরহত্যার সুবিপুল আয়োজন। এরূপ ভ্রমাত্মক জাতীয়তাবোধ আমাদের অন্য জাতির কল্যাণ কামনার বদলে তার সর্ব্বনাশের কামনাই শেখায়

এবং তাদের ভালবাসার পথ রোধ করে দেয়। এই ধরণের জাতীয়তাবোধ মানুষের মনকে খর্ব্ব করে, ছোট করে, এবং নীচু করে।

নেল্‌সন ট্রাফালগার যুদ্ধে বলেছিলেন—"England expects every man to do his duty." অর্থাৎ তাঁর মতে ফরাসী ইংরেজদের শত্রু এবং প্রতি ইংরেজের পুণ্য কর্ত্তব্য হ'ল ফরাসীদের হত্যা করা। ভগবানের চোখে যেটা নিতান্ত নরহত্যারই সামিল, জাতীয়তাবোধে অন্ধ ইংরেজের চোখে সেটাই হ'ল একটি মহান্ কর্ত্তব্য।

ফরাসীরা যখন দেশে প্রথম বিপ্লব আরম্ভ করে, তখন তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রতি মানুষের যে তিনটি জন্মগত অধিকার, তা সমগ্র মানবজাতির জন্য জয় করে দেওয়া। এই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মহিমময়ী বাণীর মানে কিন্তু পরবর্ত্তী ফরাসীদের রাজনৈতিক জীবনে একবারে বদ্‌লে গেল। তখন তার মানে দাঁড়াল এই—যে ও কথাটা কেবল ফরাসীদের নিজেদের জন্য, বিজাতীয়দের বিষয় কিন্তু সব উল্টো। তাদের স্বাধীনতা হরণ কর্‌তে হবে, তাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন না করে কর্‌তে হবে শত্রুতা এবং তাদের পদদলিত করে বৈষম্যের আস্বাদ দিতে হবে। এই জন্যই ফরাসী ছোটে ইংরেজের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কর্‌তে। যুদ্ধ বাধে, রক্তস্রোত বয়। ইংরেজ বলে—বাহবা,

কি মহৎ কাজই করছি! ফরাসী বলে—ইংরেজ মেরে কত পুণ্যই না সঞ্চয় করলাম।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ইউরোপে জার্ম্মাণ বলে কোন জাতি ছিল না। নেপোলিয়ানের বিজয়বাহিনী যখন একাধিকবার জার্ম্মাণদের বুকের ওপর দিয়ে গিয়ে, তাদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছিল, তখনই জার্ম্মাণদের জাতীয়তাবোধের জন্ম। জার্ম্মাণরা তখন মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে জার্ম্মাণ জাতির প্রতিষ্ঠা করে। তখন তাদের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, কেবল বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে নিজেদের রক্ষা করা। সেই জার্ম্মাণ জাতি অনুকূল অবস্থার সমাবেশে সমৃদ্ধি লাভ করল, একটা ক্ষমতাশালী জাতি হয়ে উঠল, বিস্‌মার্কের নায়কত্বে তা সৈন্যবলে বলীয়ান্ হয়ে উঠল। তার পরে আমরা দেখি জার্ম্মাণরা আর শুধু আত্মরক্ষায় তৎপর নিরীহ জাতি নয়। তারা তখন অত্যাচারীর আসন পরিগ্রহ করেছে, এবং ফ্রান্সকে পদদলিত করে, শোষণ করে পরম তৃপ্তি লাভ করছে। জার্ম্মাণীর তখন জাতীয় নীতিবাক্য হ'ল—"জার্ম্মাণী হবে সবার ওপরে।" তাদের লক্ষ্য হ'ল, সৈন্যবলের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর ওপর অত্যাচারের স্রোত বইয়ে দিয়ে তারা হবে সমৃদ্ধ, আর পৃথিবীর সকল জাতি থাকবে তাদের পায়ের তলায় পড়ে। গত ইউরোপীয় মহাসমরের একটা মস্ত বড় কারণ—এই কু-নীতির প্রশ্রয় দান।

মহাসমরের প্রথম ভাগে জার্ম্মাণরা যখন বেলজিয়াম অধিকার করে, তখন একটি জার্ম্মাণ মহিলা জার্ম্মাণ-রাজ্যের নিষেধবাক্য অমান্য করে বিজিত বেলজিয়ানদের সেবা-সুশ্রূষা করতেন এবং তাদের আততায়ীর কবল হতে লুকিয়ে পালাবার সাহায্য করতেন। এঁর নাম ছিল নার্স ক্যাভেল্। কিছু দিন পরে শত্রুদের প্রতি তাঁর এই দয়াশীল আচরণ জার্ম্মাণ শাসকদের কাণে গিয়ে ওঠে। ফলে তাঁর 'কোর্ট মার্শাল' হয় এবং বিচারে হয় প্রাণদণ্ড। মানুষকে সেবা করার অপরাধেও মানুষের প্রাণদণ্ড হয়, জাতীয়তা-বোধের ঠুলি চোখে পরে অন্ধ বিচারকের এমনি ন্যায়বোধ!

নার্স ক্যাভেল কিন্তু হাসিমুখেই সে মৃত্যু-আজ্ঞা শিরে ধারণ করেছিলেন এবং মৃত্যুর আগে ক্ষুদ্র একটী কথা বলে গিয়েছিলেন,—"Patriotism is not enough". জাতীয়তা-বোধের চেয়েও বড় ধর্ম্ম আছে, যার কাছে জাতীয়তাবোধের মাথা নীচু করাই উচিত। আমাদের চাই সেই বৃহত্তর জাতীয়তাবোধ—যাতে সকল পৃথিবীর মানুষকেই এক জাতি করে নেওয়া যায়। কেবল স্বজাতিকেই ভালবাস্‌লে চল্‌বে না, বিশ্বের সকল জাতিকে দেশ-জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ভালবাস্‌তে হবে; তবেই হবে মানুষের কল্যাণ, তবেই মানুষ মহত্তর হয়ে উঠবে।

ভূয়ো জাতীয়তাবোধে কলঙ্কিত এবং আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধে

বিধ্বস্ত পৃথিবীতে সেই মহান ভ্রাতৃবোধের বাণী, বিশ্বজনীন ভালবাসার বাণী শোনাবার জন্যই নার্স ক্যাভেল প্রাণ দিয়েছিলেন। এই মহীয়সী নারীর সুপবিত্র আত্মোৎসর্গের কথা মানুষ যেদিন ভাল করে ভাববে, হৃদয় দিয়ে বুঝবে—সেদিনের এখনও কত দেরী আছে বলা যায় না। তবে এখনকার মানুষের অবস্থা দেখে এই কথাই মনে হয়, যে মানুষের মন এখনও অনেক নীচে, সঙ্কীর্ণতর জাতীয়তাবোধে তা এখনও গভীর নিমজ্জিত। সে উদার বাণী 'মরমে পশিবার' সময় যেন এখনও আসে নি!

ষোল

আবার এসেছে শীত। আকাশটা আবার ধোঁয়াটে মেঘে ভরা, গাছগুলোর গায়ে একটাও পাতা নেই, আর লণ্ডনের লক্ষ লক্ষ চিম্‌নি প্রচুর ধূম উদ্গার করে করে সহরের বুকটাকে কুয়াসায় ভরে দিয়েছে।

এ সবই ত আগে দেখা আছে, অভ্যাস হয়ে গিয়েছে; কিন্তু এবারকার শীতটার যেন একটু বেশী রকম বিশেষত্ব আছে। তার তীব্রতার পরিমাপ যেন এবার অনেক বেশী। আমাদের প্রতি স্নেহ যেন তার অনেক বেশী প্রবল হয়ে উঠেছে।

ডিসেম্বর শেষ হয়ে গিয়েছে, জানুয়ারি এসে পড়েছে। তাও প্রায় চলে গেল, ফেব্রুয়ারি আস্‌তে বড় দেরী নেই। আমরা ভেবেছিলাম শীত বুঝি চলে গেল। কিন্তু ঠিক

তখনই অতর্কিত ভাবে একদিন সকালবেলায় শীত চূড়ান্ত পরিচয় দিয়ে দিলে, যেন এবার সে তার প্রচণ্ড মূর্ত্তিটি দেখিয়ে দেবার জন্যই এসেছিল।

সেদিনকার সকালটা বেশ মনে থাক্‌বে, নানা দিক হতে তা বেশ স্মরণীয় আকারেই দেখা দিয়েছিল।

সকালে উঠে আমরা 'বাথ রুমে' গিয়েছি অভ্যাস মত মুখ ধুতে, দেখি কলে জল আসে না। কেন জল আসে না নির্দ্ধারণ কর্‌তে 'বেস্‌মেণ্ট'এর কলে গিয়ে দেখা গেল—সেখানকার কলে জল অতি মন্দগতি এবং তার মুখে অনেকগুলি বরফের ঝুরি নেমেছে। তার সঙ্কেত অতি সুস্পষ্ট। 'বেস্‌মেণ্ট'এর ঘর থাকে মাটির তলায়, তাই তুলনায় তা উপরের ঘর হতে গরম। সেখানে তাই জল একেবারে বন্ধ হয় নি। কিন্তু ওপর তলায় জল পাইপে জমে বরফ হয়ে গিয়েছে, আর তরল আকার নেই, তাই কলের মুখ বেয়ে নেমে আসার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে।

তারপর ব্রেকফাষ্ট টেবিলে যখন গিয়েছি, ঝিএর খোঁজ পড়্‌ল দুধের বোতলের ওপর; সে বোতলের দুধ কিন্তু বাটিতে ঢালা যায় না, কারণ তাও জমে গিয়ে কুল্‌ফি বরফে পরিণত হয়েছে। আগুনের তাপ দিয়ে দিয়ে তবে তার তরলতা ফিরে পাওয়া যায়। ডিম ভাজ্‌বে কি,

খোলা থেকে ডিম বের হতে চায় না, তাও জমে গেছে! পিঁয়াজ ছুরি দিয়ে কাটা যায় না, তার ভিতরকার জলের অংশ জমে তাকে পাথরের মত শক্ত করে তুলেছে! এমনি নানা ভাবে শীতের কঠোরতার পরিচয় আমাদের সেদিন মিল্‌তে লাগ্‌ল।

অগত্যা শীতের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা না কর্‌লে আর বেঁচে থাকা যায় না। আগে যে পোষাকে শীত ভাঙ্‌ত, এখন তাতে ভাঙে না। 'ওভার কোট' নিয়ে গায়ে পর পর পাঁচ-ছ'টা জামা দিয়ে তবে বাইরে যেতে হয়, হাতে 'ফার্' যুক্ত 'গ্লাভস্' হলেই ভাল হয়, পায়ে সব ডবল মোজা। আগে যদি তিন-খানা কম্বল নিয়ে বিছানায় ঢুক্‌তাম, এখন ছ'খানা নিই। একটা গরম জলের ব্যাগে আর কুলোয় না, তিন-চারটে হ'লেই ভাল হয়। ঘরে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল মেলে না। কুঁজোয় জল জমাট বেঁধে বরফ হয়ে থাকে। তাকে গলিয়ে জল করে তবে খেতে হয়।

সব থেকে অসুবিধা ঘটিয়েছে এই জলের অভাব। কল আছে, কলের পাইপে জলও আছে, কিন্তু তবু জল পাওয়ার উপায় নেই। স্নান ত একান্তই অসম্ভব; সকাল বেলা উঠে মুখ ধোবার জলও জোটে না। ল্যাণ্ডলেডি নিয়ম করেছেন যে সকালে প্রত্যেকে মাত্র এক জগ করে গরম জল পাবে, তাইতে দাড়ি কামান এবং মুখ ধোয়া দুই-ই সার্‌তে হবে।

সারা দিনের মধ্যে এইটুকু জলই আমাদের বরাদ্দ। কি করে আমাদের চলে!

ঐ দিকে খবরের কাগজে সংবাদ পাই সার্পেন্টাইন্ পুকুরটা জমে গিয়েছে, রিজেন্টস্ পার্কের দীঘিও জমে গিয়েছে; তার ওপর ছেলে-মেয়েরা 'স্কেট' করে বেড়ায়। ইংলিশ চ্যানেলেও বরফ জমে জাহাজ চলাচলের বাধা ঘটায়। টেমস্ নদীর জলও জম্‌তে সুরু করেছে। দিন রাত্রি অনেকগুলি ড্রেজার লাগান হয়েছে সেই বরফ ভেঙ্গে দেবার জন্যে, যেন নদীটা একেবারে না জমে যায়।

এখানে যাদের বয়স পঞ্চাশ ষাট সত্তর, তারা বলে—এমন শীত আমরা জীবনে কখনও দেখি নি। ছোট যারা তাদের ত কথাই নেই। আর আমরা—ভারতীয়েরা, গরম দেশের লোক—আমাদের কাছে ত একান্তই অভাবনীয়।

খবরের কাগজে পড়ি আজ উত্তাপ নেমেছে ১০° ডিগ্রী ফারেণহীট, আর একদিন পড়ি ৫° ডিগ্রী, আর এক দিন ২° ডিগ্রী। এমন কি একদিন বের হ'ল উত্তাপ নেমেছে –৮° ডিগ্রী ফারেণহীটএ। অর্থাৎ বরফের উত্তাপ হ'ল ৩২° ডিগ্রী, তার নীচেও ৪০° ডিগ্রী চলে গিয়েছে। তার মানে বরফের বাবার বাবাকেও সে শীত জমিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে! শীতের সঙ্গে যুঝ্‌তে আমাদের কষ্ট হয়। বুকটা যেন কি রকম কেঁপে কেঁপে ওঠে, কাণ দুটো আর নাকের

ডগা যেন দেহের সঙ্গে যুক্ত নয়, এই রকমই একটা অনুভূতি হয়। বেশ কষ্ট হয়, তবু কিন্তু আমাদের মনে একটা গর্ব —এমন শীত এদেশী লোকেরাই দেখে নি, আর আমাদের ভাগ্যে কিনা তার সঙ্গেই সাক্ষাৎলাভ! দশ জনকে বল্‌বার মত একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে রাখলাম। আমাদের দেশে—৮° ডিগ্রী ফারেণহীটের স্বরূপই বা দেখবার সুযোগ ক'জনের ঘটেছে?

এ হেন শীতের দাপটে কাহিল হয় নি এমন বীর আমাদের মধ্যে কেউ ছিল না। কিন্তু মানস মুখার্জ্জির অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে অত্যন্ত বেশী রকম শীত-কাতর; শীতের আগমনে তার জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তন হয়েছিল সব চেয়ে বেশী।

মুখার্জ্জির আগে নিয়ম ছিল সকাল ৮ টায় ওঠা। এখন দশটার আগে ওঠতে চায় না, তাও একান্ত অনিচ্ছায়। সকলের ব্রেকফাষ্ট্ খাওয়া হয়ে যায়, কলেজে বা কাজে যাবার সময় হয়, তার কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ নেই। একে একে সকলেই তাকে বিছানা হতে ওঠাতে চায়। তবু একেবারে সমাধিস্থ মুনির মত সে নিশ্চল হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে, দেহে এতটুকু স্পন্দনও লক্ষিত হয় না। বন্ধুরা সকলেই একে একে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসে।

ঘোষ কিন্তু বলে,—আমি হার মানব না। বন্ধুর ওপর

জোর আমার সব চেয়ে বেশী, আমি তাই প্রমাণ করে দেব—তার নিদ্রা ভঙ্গ করে।

মুখার্জ্জির নিদ্রা ত সত্যকার স্বাভাবিক নিদ্রা নয়। তাই তা ভাঙ্গান বড় শক্ত। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গান বোধ হয় তুলনায় সোজা ছিল। ঘোষ তাই অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করে। বরফের ত তার অভাব ছিল না। সে হাত পুরে জানালা গলিয়ে বরফ এনে তার কম্বলের মধ্যে রেখে দেয়। এর ফল হাতে হাতেই মেলে। বরফ-স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই মুখার্জ্জির দেহের অবয়বগুলি ভারি সতেজ হয় এবং সে বিছানা পরিত্যাগ করে। বিছানা আর ত তখন শীত হতে পরিত্রাণের উপায় নয়!

তার ব্রেকফাষ্ট খাওয়াও এক অতি রোমাঞ্চকর ব্যাপার। গায়ে দু-তিনটে গরম জামা এবং তার ওপর গরম 'ড্রেসিং গাউন' চাপিয়েও তার শীত ভাঙে না। ড্রেসিং গাউনের পকেটে হাত দুটো সজোরে ঢুকিয়ে, গলাটা সঙ্কুচিত করে মাথাটাকে ঘাড়ের যতখানি নিকটে আনা সম্ভব তা করে' ধীর-মন্থর গতিতে সে খাবার ঘরের দিকে চল্‌তে থাকে। আমরা—তার সে মনোরম অভিনয়ের মুগ্ধ পরিদর্শকবর্গ—তার পিছে পিছে চলি।

গন্তব্য স্থানে পৌঁছে খাবার টেবিলের ধারে বস্‌বার লক্ষণ তার আদৌ দেখা যায় না। যেখানে 'ফায়ার প্লেসে' আগুন

জ্বল্‌ছে, তার খুব নিকটে সে একটি চেয়ার স্থাপন করে বসে, দেহটাকে যতখানি সম্ভব আগুনের দিকে এগিয়ে দেয় এবং হাত-পা গরম করে শীত নিবারণের চেষ্টা করে। এই ভাবে পনের-কুড়ি মিনিট কেটে গেলে তার খাবারের দিকে নজর পড়ে এবং সেইখানে বসেই তা সমাধা করে।

তার বন্ধুবর্গ তার দুর্দ্দশা বেশ উপভোগ করে। শুধু তাতেই ক্ষান্ত নয়, বেচারীকে নানা রকমে ব্যতিব্যস্তও করে। সে কিন্তু সমস্তই নীরবে সহ্য করে অপরিসীম ধৈর্য্যশক্তির পরিচয় দেয়।

কিন্তু আমাদের একটি অত্যাচার তার একান্তই ছিল অসহ্য। আমাদের একটা অভ্যাস ছিল বরফে হাত রেখে সেই ঠাণ্ডা হাতখানা বেচারীর পিঠে বা মুখে স্থাপন করা। তাতে সে এত বেশী অস্থির হত যে বল্‌বার নয়।

এই ভাবে শীতের জড়তার মাঝে মুখার্জ্জির দুর্দ্দশা আমরা বেশ উপভোগ কর্‌তাম এবং সে যে হাসির উপকরণ জোগাত তার জোরে শীত কাটানও আমাদের পক্ষে অনেক সহজ হয়ে উঠেছিল। মুখার্জ্জির নিকট এই কারণে আমরা সকলেই বিশেষ ঋণী।

প্রায় মাসখানেক এই রকম শীতের মধ্যে দেখতে দেখতে চলে গেল। বরফ গলান জল খেয়ে এবং গায়ে এক মণ পশমের বোঝা চাপিয়েই দিন কাট্‌ত। স্নান ত একেবারেই

বন্ধ। আমরা এক রকম এস্কিমোই হয়ে গিয়েছিলাম যেন!

সৌভাগ্যক্রমে একদিন এই শীতের প্রকোপ কমে গেল এবং আমরা আবার সহজ ভাবে জীবন যাত্রা আরম্ভ করলাম। এ শীত এসেছিল যেমন হঠাৎ, গেলও একদিন সেই রকম অতর্কিত ভাবে।

তার যাওয়ার সুসংবাদটি আমরা পেয়েছিলাম বেশ একটু অদ্ভুত উপায়ে। একদিন গভীর রাত্রে দোতলার সিঁড়িতে জল পড়ার শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে জল একটা ছোটখাটো ঝরণার মতই জোরে শব্দ করে বাড়ীটাকে ভাসিয়ে দিচ্ছিল। জেগে উঠে জান্‌লাম যে শীত পালিয়েছে, তাই পাইপের বরফ গলে আবার জল হয়ে প্রবহমান হয়েছে। কিন্তু এমন অদ্ভুত ভাবে অসময়ে আত্মপ্রকাশের কারণ—বরফ জম্‌বার সময় তার চাপে পাইপ ফেটে গিয়েছিল, তখন জল বরফ আকারে ছিল বলে পড়ে নি, এখন জল হয়ে সেই পথ বেয়ে নেমেছে

ছেলেবেলায় ভূত ঝাড়ানর গল্পে শুন্‌তাম যে ভূত ছাড়লে গাছটাছ পড়ে যায়। আমাদের শীত-ভূত ঘাড় হতে নাম্‌ল, আর পাইপ ভেঙে জল ছুট্‌ল রাত-দুপুরে। এ কোন্ ওঝার ব্যবস্থা কে জানে!

সতের

গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন অনেক কাল আগে। তারপর প্রায় আড়াই হাজার বছর কেটে গিয়েছে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে মানুষের জ্ঞানের উন্নতি যথেষ্ট হয়েছে, বাস্তব সমৃদ্ধিও সেই অনুপাতে অনেক বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু তার হৃদয়বৃত্তির ত কোন উন্নতির লক্ষণই দেখা যায় না। সে বিষয়ে তার যেন অধোগতি হয়েছে।

গৌতম বুদ্ধ শিখিয়েছিলেন জীবে প্রেম ধর্ম্ম। সেই মহা মন্ত্র সেকালের পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোকই মাথা পেতে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তারপর যত দিন গিয়েছে, সে উদার বাণীর আকর্ষণ লোকের মনে তত শিথিল হয়ে এসেছে। এখন যারা বুদ্ধপন্থী, তাদের সংখ্যা অতি অল্প এবং তারাও বড় আর নিষ্ঠার সঙ্গে জীবে-দয়া-নীতির অভ্যাস করে না

অন্যের প্রতি দয়া দেখান মানুষের পক্ষে বড় শক্ত। অন্যকে সাহায্য করতে যেটুকু সামর্থ্য বা স্বার্থত্যাগ দরকার সেটাকে সে অপব্যয়ই মনে করে। একজন অপরকে সাহায্য করবার প্রেরণা পায় সাধারণতঃ অপরের দুর্দ্দশার জন্য অনুকম্পা থেকে। এই অনুকম্পাবোধ এবং সাধারণ অর্থে সাহানুভূতি—এরা দুই হ'ল একই জিনিষ।

এর চেয়েও বড় প্রেরণা আছে, যা স্বতঃই পরোপকারে উৎসাহিত করে। সে হ'ল প্রেম বা ভালবাসা। মা সন্তানের জন্য নিজের প্রাণ বলি দিতে এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করেন না, তাঁর প্রেরণা হ'ল এই ভালবাসাই। অনুকম্পার চেয়ে এ মহত্তর। অনুকম্পার মত এখানে পরস্পরের স্বার্থ বিভিন্ন নয়। ভালবাসার মোহন মন্ত্রে স্বার্থ একেবারেই এক হয়ে যায়। সন্তানের প্রাণরক্ষায় সন্তানের যতখানি স্বার্থ, মায়ের স্বার্থ এক তিলও তার-কম নয়। মা প্রাণ দেন, দয়াপরবশ হয়ে নয়, নিজের গরজেই দেন। উপনিষদের ঋষিরা এই কথাটিকে অতি পরিষ্কার রূপেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ী তাঁর পতি যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—মানুষকে মানুষ ভালবাসে কেন? তিনি বলেছিলেন যে, যে ভালবাসে তার মধ্যেও যে ব্রহ্ম আছেন, যে ভালবাসার পাত্র তার মধ্যেও তিনিই আছেন। পুত্রকে মা ভালবাসেন, তার কারণ

পুত্রের প্রতি ভালবাসা নয়, নিজের প্রতি ভালবাসাই তাঁকে পুত্রের কল্যাণে নিয়োজিত করে। 'নহি, পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।'

এইরূপে ব্যাপকভাবে নিজেকে দশজনের মধ্যে আবিষ্কার করে নিলে নিজের স্বার্থ আর মানুষের আলাদা থাকে না। দশ জনের স্বার্থ নিজের স্বার্থের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। এইরূপে নিজের স্বার্থের গণ্ডি বাড়িয়ে নিলে পরের জন্য কাজ করতে আর স্বার্থত্যাগের কষ্টবোধ থাকে না। তখন স্বার্থসাধনে সাধারণ মানুষের মনে যে আত্মতৃপ্তিবোধ জাগে, সে বোধ হতে সে বঞ্চিত হয় না, অথচ সকলেরই মঙ্গল-সাধন হয়। এ হ'ল আপনাকে বিলিয়ে দেবার ধর্ম্ম, নিজেকে দশ জনের মধ্যে ব্যাপকভাবে পাবার ধর্ম্ম।

কিন্তু যেখানে মানুষের ব্যক্তিত্ববোধ অত্যধিক জাগ্রত, সেখানে এই বিলিয়ে দেবার ধর্ম্মের স্থান নেই। ব্যক্তিত্ববোধ মানুষের চারিধারে এক দুর্গম প্রাচীরের সৃষ্টি করে, তাকে ডিঙিয়ে হৃদয়ের প্রসার হওয়া অসম্ভব। মানুষকে নিজের স্বার্থের গণ্ডির মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। কচ্ছপের খোলার মত সেই আবেষ্টনী তার হৃদয়বৃত্তির পরিবর্দ্ধনকে থামিয়ে দেয়।

আধুনিকযুগে ইউরোপের বিজ্ঞান জ্ঞান-ক্ষেত্রকে যথেষ্ট

প্রশস্ত করে দিয়েছে। প্রকৃতির প্রায় সকল শক্তির ওপরই আজ তার প্রভুত্ব। সকল প্রকার বাস্তব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই এখন ইউরোপ-বাসীদের করতলগত।

এই সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সামগ্রী সকলই যে একেবারে পরিহার্য্য হওয়া উচিত, তা নয়। খানিক পরিমাণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তার আত্মবিকাশের জন্যই একান্ত প্রয়োজন। মানুষ একেবারে আদিকালের স্বচ্ছন্দ বনবাসের জীবনে ফিরে যেতে পারে না, কারণ তা' হ'লে তার সভ্যতাকেও জলাঞ্জলি দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এই অতি-প্রচুর বাস্তব স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ মানুষকে বেশীরকম ইন্দ্রিয়পরায়ণ করে তোলে। মানুষের নানা বহিরিন্দ্রিয়েরই তারা খোরাক জোগায়। তার ফলে মানুষের দৃষ্টি কেবল বহির্মুখী হয়ে পড়ে, অন্তর্মুখী হতে আর চায় না; দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ছাড়াও যে একটা মানসিক সুখানুভূতির উৎস রয়ে গিয়েছে, সে কথা মানুষ ভুলে যায়। দৈহিক সুখ কেবল ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব, তা যেন তাকে সমস্ত জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কিন্তু মানসিক সুখের বিশেষত্ব এই যে তা দশ জনের সঙ্গে প্রাণের বিনিময়ের সহায়ক। একটি সুন্দর ভাব বা সুন্দর সুর মনে যে সুখানুভূতি জাগায়, তা মনকে কেবল স্নিগ্ধই করে না, তাকে আরও উদার করে তোলে। এই কারণে দৈহিক সুখপরায়ণতা মানুষের

স্বার্থবোধ প্রখর করে এবং একান্ত সঙ্কুচিত ব্যক্তিত্ববোধ জাগিয়ে তুলে তার হৃদয়বৃত্তিকে খর্ব্ব করে।

আধুনিক যুগকে ইউরোপ বলে ব্যক্তিত্ববোধ জাগরণের যুগ। এত দিন মানুষ জনসাধারণের মধ্যে ডুবে ছিল। প্রত্যেক মানুষের যে একটা আলাদা সত্বা আছে, প্রত্যেকেরই যে কতকগুলি জন্মগত অধিকার আছে—এ বোধ এখন সবার জেগেছে। প্রতি মানুষ তাই তার ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করবার জন্য যে যার অধিকারের দাবী করে বসেছে।

আমার কিন্তু মনে হয় বাস্তবিক ব্যক্তিত্ব বোধ তাদের জাগে নি, তাদের জেগেছে স্বার্থবোধ। এখনকার মানুষ নিজেকে আর সকল হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ভাবতে শিখেছে। অন্য কারও স্বার্থের কথা সে ভাবে না, ভাবে কেবলমাত্র নিজের স্বার্থ। অন্যের লাভ হোক বা লোকসান হোক, নিজের স্বার্থই সর্ব্বস্ব। এর ফলে মানুষ অন্যকে ভালবাসার মত উদারতা ভুলে গিয়েছে, এখন সে অন্য সকলের সঙ্গেই বিদ্বেষভাবাপন্ন। জগৎ-জুড়ে যেন একটা ভীষণ স্বার্থের সংঘর্ষ চলেছে, তাতে প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্বার্থ অন্বেষণে ব্যস্ত, অন্য কারও স্বার্থের প্রতি চাইবার আর কারও অবসর নেই।

আধুনিক ইউরোপের একটি নূতন মতবাদ হ'ল সোস্যালি-জম্। আপাতদৃষ্টিতে তাতে একটা উদারতার ছাপ আছে

বটে, কিন্তু তলিয়ে দেখলে তার মধ্যেও ওই ব্যক্তিগত স্বার্থহেতু বিদ্বেষভাব যথেষ্ট মেলে। সোস্যালিজম্ এ কথা বলে না যে—ধনী ও দরিদ্র সকলেই মানুষ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্ভোগের অধিকার সকলের সমান থাকা উচিত। *সোস্যালিজম্ বলে—ওই যে লোকটা এত অর্থ উপার্জ্জন করে,* রোজ মোটর হাঁকিয়ে চলে, আর আরামে দিন কাটায়, তোমরা তা পাও না। তোমরা যা পাও না, তা ওকে ভোগ করতে দেবে কেন? ওর সমস্ত কেড়ে কুড়ে নিয়ে এস, আমরা সকলে ভাগ করে নেই। এখানে দশ জন গরীব একত্র হয় ধনীর উচ্ছেদ সাধনের জন্য। ঈর্ষা এবং ঈর্ষা হেতু বিদ্বেষই এই নীতিবাক্যের প্রেরণা জোগায়। এতে মানুষের উন্নতি সাধন করে না, বরং তার মনকে নীচু করে দেয়।

অর্থ এবং বাস্তব ভোগসামগ্রীরই না হয় ভাগ-বাটোয়ারা সম্ভব, কিন্তু মানুষের শান্তি এবং তৃপ্তি ত কেবল তাই নিয়েই নয়। তারা বাস্তব নয়, তাই তাদের এই রকম জোর-জবরদস্তি করে ভাগ করে দেওয়া সম্ভবও নয়। এই হিংসামূলক এবং বাস্তব ভোগলালসাপ সোস্যালিজম্ মানব-সমাজের কল্যাণ সাধনে সক্ষম কিনা, সেটা বেশ করে ভেবে দেখ্‌বার বিষয়।

বিজ্ঞানের উন্নতি মানুষকে শক্তি এনে দেয় অপরিসীম, সে কথা নিঃসন্দেহ। শক্তি ত হাতে পেলাম, তাকে নিয়োগ

কর্‌ব কেমন ভাবে, সে শিক্ষা কিন্তু বিজ্ঞান দিতে পারে না। ভাল লোকের হাতে ক্ষমতার সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত, কিন্তু তেমনি মন্দ ব্যক্তির হাতে তার অপব্যবহারের সম্ভাবনাও বেশী। সুতরাং শক্তি জিনিষটা এমনি যে মানুষের নিছক কল্যাণ সাধন করে—এমন নয়; তার সার্থকতা নির্ভর করে উপযুক্ত সদ্ব্যবহারে।

পশ্চিমের মানুষ এখন বিজ্ঞানের কল্যাণে শক্তিমদে মত্ত। তার ওপর তার অপ্রশস্ত ব্যক্তিত্ববোধ তাকে একান্ত স্বার্থপর করে তুলেছে। তার লালসা যে পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, হৃদয়ের প্রসার সেই পরিমাণ কমে এসেছে। পরের জন্য ভালবাসা বহন করাটাকে সে নিতান্ত পরের বোঝা টানার মতই মনে করে। বিজ্ঞান-প্রদত্ত শক্তির স্বার্থকতা খোঁজে সে কেবল মাত্র নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ কর্‌বার চেষ্টায়।

এ কথা প্রমাণ কর্‌তে বেশীদূর যাবার দরকার নেই, বিবাহ সম্পর্কে এদের ধারণা দিয়েই বেশ বোঝা যাবে। বিবাহটা তাদের মতে Sacrement, কি Contract—একথা আলোচনা কর্‌বার দরকার নেই। 'বিবাহ' কথাটা তুলে দিয়ে না হয় 'দম্পতি' কথাটাই ব্যবহার কর্‌লাম।

দাম্পত্য জীবন সম্ভব হতে হ'লে চাই নারী ও পুরুষের এমন সুগভীর ভালবাসা, যেখানে উভয়ের স্বার্থ ওতঃপ্রোত

ভাবে মিশে গিয়েছে। সেখানে নারীর লক্ষ্য হয়—তার একমাত্র জীবন-সাথীর কল্যাণ এবং পুরুষের কর্ত্তব্য হবে সঙ্গিনীর কল্যাণ কামনা।' এই ভাবে প্রেম যেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে প্রেম চিরস্থায়ী। তাদের কেউ মন্দ হ'ন, কেউ বা নির্গুণ হ'ন, তাতেও কিছু এসে যায় না। মা যেমন ভাল-মন্দ-নির্ব্বিশেষে তাঁর ছেলেকে ভালবাসেন, এখানেও তখন সেই সম্বন্ধটি এসে দাঁড়ায়।

এরূপ দাম্পত্য প্রেমের জন্য প্রয়োজন হৃদয়বৃত্তির বিকাশ। এখানে সেই শিক্ষারই প্রয়োজন, যে নিজের স্বার্থকে সম্পূর্ণ-রূপে দূরে ঠেলে প্রিয়জনের স্বার্থকে হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। হীন ব্যক্তিত্ববোধে কলুষিত এখনকার মানুষের মনে কিন্তু এমন উদারতা নেই। নিজের স্বার্থ তার কাছে এত বড় যে তাকে সিংহাসনচ্যুত করে অন্যকে স্থান দিতে সে একেবারেই অসমর্থ। তাই এখনকার মানুষ ভেবে উঠ্‌তে পারে না, প্রেমে একনিষ্ঠতা কি করে সম্ভব। এখনকার বিবাহের ভিত্তি—প্রেম নয়, পরস্পরের সুবিধা বা 'কন্‌-ভিনিয়েন্স'। অর্থাৎ 'তোমাকে আমার ভাল লাগে, আর আমাকে তোমার ভাল লাগে, তাই এস আমরা এক সঙ্গে থাকি।' বিবাহিত জীবন আরম্ভ কর্‌বার আগে আজকালকার দম্পতি এই কথাই পরস্পরকে বলে। এ কথা বল্‌বার মত উদারতা তাদের নেই যে 'তোমাকে সুখী করাই আমার

জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, সেই জন্য আমাকে তোমার জীবন-সঙ্গী কর।' এই দাম্পত্য-জীবনে যখন একের অপরকে আর ভাল লাগে না, তখনই সে দাম্পত্য-জীবন ভঙ্গ করবার প্রয়োজন বোধ করে। এখানে একজন আর একজনের স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ মাত্র। যে মুহূর্তে অপর জন আর স্বার্থসিদ্ধির সহায় থাকে না, সেই মুহূর্তেই এই দাম্পত্য-জীবনের উচ্ছেদ দরকার হয়ে পড়ে। যাকে শুধু ভাল লাগে, তাকে দু' দিন বাদেই ভাল না লাগ্‌তে পারে, কিন্তু যাকে ভালবাসি, তাকে ত চিরকালই ভালবাসি। *

শুধু এই নয়, পিতৃত্ব বা মাতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ কর্‌তেও আধুনিক নরনারী অনিচ্ছুক। হৃদয়ের সহজ টানে সন্তানের প্রতি যে দায়িত্ব অতি সহজে সম্পাদিত হয়, সেটাকেও তারা বোঝা মনে করে। সন্তানের সন্নিধি মায়ের আজকাল কামনার জিনিষ নয়, তার ব্যক্তিগত যথেচ্ছ জীবনের বাধা স্বরূপ। আধুনিক নরনারী এ জন্যই দাবী করে যে শাসন-যন্ত্রের সকল সন্তানসন্ততির পরিপালনের ভার নেওয়া উচিত, আর সন্তানকে জন্ম দিয়েই মায়ের কর্ত্তব্যের নিবৃত্তি।

জীবন সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের মোটামুটি ধারণা কি, তাদের 'আউট্‌লুক' কি ধরণের, তা এক অতি তুচ্ছ উদাহরণ

---

* Judge Lindsay—Companionate Marriage এবং Narman Haire—'Hymen or the Future of Marriage' দ্রষ্টব্য।

হতেই বেশ সহজে বোঝা যাবে। লণ্ডনের পথে-ঘাটে, ষ্টেশনে-ষ্টেশনে হরলিক্স্এর এক বিজ্ঞাপন প্রায়ই দেখা যায়, তার ধরণটা এইরূপ,—তাতে লেখা আছে, 'Life is a series of funs.' আর তার সঙ্গে দেওয়া আছে নাচ, সমুদ্র-স্নান, মোটরে ভ্রমণ প্রভৃতির ছবি। তলায় লেখা আছে জীবনের এই সব সুখ সম্যকরূপে উপভোগ করতে হ'লে চাই অটুট স্বাস্থ্য; অতএব হরলিক্স্ অপরিহার্য্য খাদ্য। মানুষের জীবনের আদর্শ আর কতখানি খর্ব্ব করা যায়, তা বলা শক্ত।

ইউরোপের চিন্তাধারায় এখন হৃদয় বলে জিনিষটার কোন স্থানই নেই। ওটা যেন একটা বেখাপ্পা জিনিষ, দূরে টেনে ফেলে দেওয়াই ভাল। কেউ যদি কারও জন্য কাঁদল, লোকে বল্বে—'Don't be sentimental. That's silly.' ইউরোপের 'ইউটোপিয়া'তে মানুষের থাক্বে একটি রক্ত-মাংসের অটুট স্বাস্থ্যসম্পন্ন দেহ, আর থাক্বে বিজ্ঞান, সেই দেহের রক্ত-মাংসের যত কিছু ক্ষুধা বা দাবী আছে, তাই মেটাতে। তাদের ইউটোপিয়াতে আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। *

ইউরোপ এখন বুদ্ধি ও সমৃদ্ধিতে জগতের শীর্ষস্থানীয়। এখন তাই ইউরোপ 'মহাজ্ঞানী মহাজনের' আসন গ্রহণ

* Stephen Leacock—'Afternoons in the Modern Utopia' দ্রষ্টব্য।

করেছে। আর সেই কারণে জগতের অন্য জাতিরা তাদের অনুসরণ এবং অনুকরণ করতে সুরু করেছে, কারণ তাদের ত শাস্ত্রের দোহাই রয়েই গিয়েছে—'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'!

সত্যই তাই যদি ঘটে, তা হ'লে মানব-সভ্যতার চরম সর্ব্বনাশের দিন ঘনিয়ে এসেছে বল্‌তে হবে। মানুষ ত কেবল রক্ত-মাংসের জীব নয়, তার হৃদয় আছে, তার জ্ঞানপিপাসাও আছে। নিছক দেহের সুখের চরিতার্থতা খুঁজে তার পরমার্থ লাভ হবে না। এই প্রসঙ্গে আমার উপনিষদের একটি গল্পের কথা মনে পড়ে গেল; তাতে আমার কথা আরও ভাল করে ব্যক্ত হবে।

কঠোপনিষদে আছে যে নচিকেতা যমের বাড়ী গিয়ে তিন দিন অনাহারে ছিলেন। ঘরে উপবাসী অতিথি, যমের তা কি ভাল লাগে! তিনি তাই নচিকেতাকে অন্ন গ্রহণ করতে অনুরোধ কর্‌লেন। নচিকেতা বল্‌লেন—মৃত্যুর পর মানুষের কি হয় আমায় জানাও, তবে অন্নগ্রহণ করব যম কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর দিতে মোটেই ইচ্ছুক ন'ন। তাকে তাই লোভ দেখালেন; বল্‌লেন—তুমি নাও বহু অশ্ব, হস্তী হিরণ্য, নাও প্রকাণ্ড জমিদারী এবং সুদীর্ঘ জীবন। পার্থিব জীবনে যা কিছু সুখ উপভোগ সম্ভব, সে সমস্তেরই আমি সুব্যবস্থা করে দিচ্ছি, 'অন্যং বরং নচিকেতা বৃণীষ্ব, ম

মোপরোৎসীঃ'। নচিকেতা বল্‌লেন—জীবন যতই দীর্ঘ হ'ক, সেও ত অল্প। অর্থ দিয়ে ত মানুষ তৃপ্তি পেতে পারে না। যত দিন খুসী আমায় বাঁচিয়ে রেখ, কিন্তু প্রশ্ন আমার বদ্‌লাবে না। ("অপি সর্ব্বং জীবিতম্ অল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে। নহি বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ।")

দৈহিক সুখ মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারে না। কারণ, মানুষের আধখানা দেহ হ'লেও আরও আধখানা তার মন আছে। সে মনের তৃপ্তি জ্ঞানপিপাসা নিবারণে, সে মনের তৃপ্তি হৃদয় বৃত্তির প্রসারণে। শুধু দৈহিক সুখান্বেষণের পথে মানুষের অন্তরের তৃপ্তি নেই, মানুষের অন্তরাত্মার অনুমোদন নেই।

আঠারো

দু' বছরেরও ওপর হয়ে গিয়েছে। আমার দেশে ফের্‌বার সময় এগিয়ে এল। প্রথম যখন এ দেশে আসি, তখন কি করে এই সুদীর্ঘ কাল কাট্‌বে ভেবে পেতাম না, কিন্তু এখন সেটা ভাবা সম্ভব হয়েছে। আর কয়েক মাস গেলেই আমি ত আবার দেশে!

এবারকার গ্রীষ্ম আমাকে আশার বাণী এনে দিয়েছে। এবারকার শীত যেমন ছিল তীব্র, বসন্ত তেমন মধুর এবং গ্রীষ্ম আরও মধুময়। অন্য বারকার গ্রীষ্মে সৌন্দর্য্য ছিল বটে, কিন্তু তার বাণী আমার অন্তরকে জাগাতে পারে নি। এবারকার গ্রীষ্ম যে বাণী নিয়ে এল, তা আমার অন্তরকেও জাগিয়ে দিয়েছে।

* * * *

পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, পাশও করেছি। দেশে যাব, আমার দেশকে ফিরে পাব,—ভাব্‌তে শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে পুলকে নেচে ওঠে। দেশ আমার স্বদেশ—তার মানে ত ভূগোলে লিখিত একখণ্ড ভূমিমাত্র নয়। সেখানে আমার আত্মীয়বন্ধু সব, যত সুখস্মৃতি সব। সেখানেই আমার সকল আনন্দ, তাকে অবলম্বন করেই ত আমার ভবিষ্যতের সকল সোনার স্বপ্ন গড়ে উঠেছে। যে কয়েকটা দিন সাম্‌নে আছে, সেগুলোকে কোন রকমে ঠেলে দিতে পার্‌লেই ত হ'ল। এতদিনকার সাধনা বুঝি আমার সফল হতে চলেছে!

এখনকার দিনগুলি কাটে অতি সহজে। কোন কাজ নেই, পড়াশুনা নেই, মন হয়ে গেছে হাল্কা। ঘুরে ঘুরে, বেড়িয়ে বেড়িয়ে আর পরিচিতদের সঙ্গে দেখা করে করে এখন সময় কাটে।

'রাঙাদি' দেখা কর্‌তে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাই আজ তাঁর বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছি। ভাইটির সঙ্গে এই তাঁর বোধ হয় শেষ দেখা, তাই মনের আজ ভারি ঘটা।

বেশী কথা আজ তিনি কইতে পারেন না। মন তাঁর আজ অবসন্ন। আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না, সে ভাবনা তাঁকে সত্যকার দিদির মতই ব্যথিত করে তুলেছে। তাই তিনি কথা ক'ন অল্প।

এ দেশটার কোথাও যদি আমার মন পড়ে থাকে তা হই আমার 'রাঙাদি'র পায়েই। বিদেশে এসেও একান্ত অসাধ্যসাধনের মতই তিনি স্নেহময় আচরণ দিয়ে আমাকে একেবারে ছোট ভাইটি করে নিয়েছিলেন। যাবার সময় তাঁর জন্য মন আমার সত্যই কাঁদবে।

আজ তিনি তাঁর বাড়ী হতে ষ্টেশন পর্য্যন্তই আমার সঙ্গে এসেছেন। শেষ দেখা, সেটার স্থায়িত্ব যতখানি সম্ভব দীর্ঘতর করা হবে। ট্রেণ এল, গাড়ীতে উঠলাম। দেখলাম 'রাঙাদি'র মুখখানি ম্লান হয়ে এসেছে। তিনি বাংলা ভাষাতেই বললেন, 'আবার দেখা হবে।'

মানুষের মন এমনি করেই ভাবে। কোন প্রিয়জনের সঙ্গে কোন দেখাকেই সে শেষ দেখা বলে মেনে নিতে চায় না। সে ভাবে আবার দেখা হবে, এই ত শেষ দেখা নয়। এমন করেই সে আত্মপ্রবঞ্চনা করে। কিন্তু তবু তা ভারি মধুময়।

* *

দেশে ফেরবার দিন সত্যিই এসে হাজির। আজকের দিনে আমার যে অপার আনন্দ, তার তুলনা কোথায় পাব জানি না। আমার ত মনে হয় আজ আমি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুখী।

ঠিক আর একটি দিনের কথা মনে পড়ে, যে দিন বোম্বাই হতে জাহাজে উঠি। জাহাজে ওঠার পর সেদিন মনে হয়েছিল, আমার হৃদয়ের সকল আশা-আনন্দ সুখস্বপ্ন সব ওই ডাঙায় ফেলে এলাম। আজ আবার আটাশ মাস পরে জাহাজে উঠেছি। আজ মনে হচ্ছে এতদিন হৃদয়খানি শুকিয়ে মরে নীরস হয়ে পড়েছিল; আজ যেন তা আশা-আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ হয়ে সজীব হয়ে উঠ্‌ল।

সেদিনকার দুঃখের সকল কালিমা আজ ধুয়ে মুছে গেছে। আজ হৃদয় আমার আনন্দে উথলে উঠছে। সেদিনকার দুঃখের আতিশয্যই আমার আজকের এই আনন্দে গভীরতা এনে দিলে। আজকের দিনের এই আনন্দ অনুভূতি কখনই সম্ভব হত না, সেদিনকার সেই দুঃখ যদি বুক পেতে না নিতাম। এই যেন চিরন্তন নিয়ম। অন্ধকারের পরেই প্রভাতের আলো সুন্দর মানায়। সাগরের কালো ঢেউএর বুকেই ফেনার শোভা ভাল ফোটে!

* * *

ডোভার বন্দর হ'তে জাহাজ ছেড়ে দিল। পাশে খড়ির পাহাড়গুলো সূর্য্যের আলোতে সাদা ধব ধব করছে। যে দেশ এতদিন আমার আশ্রয়ভূমি ছিল, ওই হ'ল তার শেষ চিহ্ন।